Boighar.com

বিএবিডি ও বইঘর নিবেদন

# অপূর্ব অপেরা

শফীউদ্দীন সরদার

রোকন

বইঘর

# অপূর্ব অপেরা

www.boighar.com

শফীউদ্দীন সরদার

পরিবেশনায়

www.boighar.com

**খন্দকার প্রকাশনী**
বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

**নিউ আনোয়ার বুক ডিপো**
৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

অপূর্ব অপেরা

শফীউদ্দীন সরদার

www.boighar.com

প্রকাশক : খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট, ঢাকা।

মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯

www.boighar.com

স্বত্ব লেখক

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ ঈসায়ী

চতুর্থ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ঈসায়ী

www.boighar.com

মুদ্রণ আল-আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিশদাশ লেন, ঢাকা-১১০০।

বিনিময়: ১৬০/- টাকা মাত্র।

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at
boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# ভূমিকা

www.boighar.com

মঞ্চের উপরে যে সব শিল্পীরা আনাগোনা করেন, এ পোড়ামাটি বন্ধার দেশে কালচার বা সংস্কৃতির ভূমিকে যাঁরা প্রাণবন্ত সবুজাঙ্গন করে তোলেন, ব্যক্তিগত জীবনে কি চরিত্রে রূপদান করেন তারা ? ধর্মান্ধতা, সংস্কার, সঙ্কোচ, লোকনিন্দা, অর্থাভাব ইত্যাদি প্রতিকূল স্রোতের মুখে অক্লান্ত পরিশ্রমে মঞ্চে যারা সমাজের প্রতিকৃতি মূর্ত্ত করে তোলেন, তা দেখে সমাজ, ব্যাক্তি–সবাই উট পাখির মতন বালিতে ঠোঁট গুজে ঠুনকো বাহবা দেয় বটে, কিন্তু চোখ মেলে তাদের কথা প্রত্যয়ের সাথে বলতে এগিয়ে আসেন ক'জন ? বহু দেশদর্শী, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ লেখক সে সব কথাই মন খুলে বলে গেছেন তার অপূর্ব অপেরায়।

মানুষের জীবনচরিত বড়ই বিচিত্র। তাকে আখ্যায়িত করা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায়। সাধারণের স্রোতে মিশে বিদগ্ধ পরিবেশে লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন দীর্ঘদিন। তিনি ভড়ং দেখেছেন অনেক, মানুষ পেয়েছেন কম।

www.boighar.com

সমস্ত আখ্যানটি গতিশীল। রসিকপ্রবণ মানুষ, তাই সমাজের দগদগে ক্ষতকে রসিকতার প্রলেপ দিয়ে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। হৃদয়ের আস্বাদ আর ধ্রুপদী আহবানে অনন্য হয়েছে বইটি। মনের চিরন্তন বাসনা সংঘাতের মধ্যে যে মিল খুঁজে পায়–এ কথা দিয়েই শেষ হয়েছে 'অপূর্ব অপেরা'। এর মূল্যায়নের ভার পাঠকের।

– মহসীন আলম

# প্রসঙ্গ কথা

অপূর্ব অপেরায় লেখক আবলীল মনের সুপ্ত ব্যাথা বাসনা, আত্মতৃপ্তি ভালবাসা, ঘাত-সংঘাত, বিরহ, বঞ্চনা আত্ম-প্রতয়ী মনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। চলমান সংঘাতের মাঝেও চিরন্তন প্রত্যয়ী মন মিলনের আবেগে উচ্ছ্বাসে যে কত নির্মল! তার প্রস্ফুটন এঁকে তুলেছেন তার এ উপন্যাসে। লোক নিন্দা আবেগ প্রবণ মনে যে বিস্বাদের ছাপ ফেলে এ সত্যটুকু অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করেছেন। লেখক তার বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে লেখনির মাধ্যমে অপূর্ব মনের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে বাস্তব জীবনের প্রতিফলন প্রকাশ করেছেন। আবহমান বাংলার সমাজ চিত্রের সুন্দর প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন তার লেখার ঐ স্রোত ধারায়।

# অপূর্ব অপেরা

## শফীউদ্দীন সরদার


কৃতজ্ঞতা

ROKON

SCAN & EDITEDBY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING
THE ORIGINAL BOOK.

# এক

www.boighar.com

প্লাটফরমে ঢুকে চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি সবেমাত্র, এমন সময় শুরু হলো এলোপাথারী কীল। অবশ্য হাতের নয় কথার। কোন সাত পাঁচে না গিয়ে নিজের কাজ কেউ নিজে করবে নিশ্চিন্তে, এ সমাজে সে আশাও দূরাশা। কারণ, আমাদের চার পাশে 'ভাত দেয়ার ভাতার' আছে একটা, কীল দেয়ার গোঁসাই আছে হাজারটা। কলজে এবং পিঠটা আয়রণ মেড না হলে, লাঠালাঠি এড়িয়ে জীবন-যাপন দুঃসাধ্য।

এই কীল দেয়া গোঁসাইটির নাম জনাব আলী। ডাক নাম জনা। উনি আমার অতীতের প্রতিবেশী, বর্তমানের সহযাত্রী। দীলটা আমার বরাবরই কীলপ্রুফ। তাই চায়ের সাথে হাসিমুখে গিলেতে লাগলাম কীলগুলোঃ

–কোলকে টোলকে চলে ?

– হরদম।

বোতল ?

–দেদার।

– কামিনীযোগও আছে নিশ্চয়ই ?

– তা আর বলতে।

– বাপের বিষয় বিত্ত তাহলে-

– আপাততঃ চিত্তবিনোদনেই লাগছে।

– সাব্বাস! তা ভান্ডার বুঝি ঠান্ডা মেরে গেছে ?

–কি করে আন্ডারস্ট্যান্ড করলেন?

–কাশীর পান্ডার চেয়েও যে চেহারাখানা চটকদার !

–আজ্ঞে না। আন্ডারগ্রাউন্ডে এখনও যা আছে, তাদিয়ে অনায়াসে অধঃপাতে যেতে পারবো।

– ডাণ্ডামারার পাশে কেউ নেইতো, তা পারবেন বৈকি-!



বইঘর.কম ও রোকন

মুখ বাঁকা করে অন্যত্র সরে দাঁড়ালেন আমার এই উৎকট শুভাকাঙ্খী। আমি নিঃশেষিত পেয়ালাটা স্মিতহাস্যে রেখে দিলাম টী-স্টলের টেবিলে।

বিত্তের বাজারে সাহিত্য একটা ফালতু বস্তু। পণ্য তো নয়ই, আবর্জ্জনার চেয়েও নগন্য পদার্থ। অর্থ আমদানীর সামর্থই যেখানে যোগ্যতার মাপকাঠি, সেখানে সাহিত্য সাধনার অর্থই হলো, – সাধ করে ঘরে অনর্থ আর বাইরে ব্যর্থতা ডেকে আনা। এর উপর আবর নাটক। যত না-ট-কই হোক, ওর চটকই আলাদা। ওর পেছনে ছুটলেই শয়তানের ঘোটক বলবেন সনাতনপন্থীরা। সমাজে আটক না হলেও, অবজ্ঞা সইতে হবে ফাটক ফেরতা সিঁদেল চোরেরও অধিক। চোর ডাকাতের তবু একটা সুবিধে আছে। মনে মনে হেলা করলেও, ঠ্যালার ভয়ে ওদের খানিকটা খাতির করেন অনেকেই। কিন্তু নাট্যসেবীরা একেবারেই লা ওয়ারিশ। কেয়ার তো নয়ই, একটু করুণা করার লোকেরও যথেষ্ট অভাব। অবশ্য দোষটা অন্যের নয়। কথায় বলে–চ্যারিটি বিগিনস এ্যাট হোম। উপার্জ্জনে মন না থাকায় হোমেই যারা ডোমের অধিক অস্পৃশ্য, বাইরে তারা পুষ্পাঞ্জলী পেলে একমাত্র মঞ্চেই তা সম্ভব নাটকের প্রয়োজনে। অন্যথায় গোত্রে এরা সর্বত্রই রাজবংশী। রাজ নজর ছাড়া–অর্থাৎ মোটা অংকের জাতীয় পুরস্কার বিহনে এদের জাতে ওঠার বিধান নেই।

আমি এদেরই একজন তাও আবার হরিজন অভাজন নই। এ লাইনে একেবারে মহাজন। নট ও নাট্যকার। এমন জনকে লক্ষ্য করে পাঁচজন পাঁচরকম কটাক্ষ করবেন, আমাদের সমাজে এটাইতো বিলক্ষণ ব্যাপার। নেহাতই গরুচোর বলে যে পুলিশে দেয়না– এইতো ঢের। তাই এই যাত্রী বন্ধুর মাত্রাধিক গাত্রদাহে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না। চায়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে নীরবে পা বাড়ালাম ওয়েটিং রুমের দিকে।

www.boighar.com

কিন্তু হায়রে আমার নসীব। ওয়েটিং রুমের দরজায় পা রাখতেই আটকে গেল পা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম খানিকটা চমকে উঠেই। সন্দেহ মোচন হেতু লোচন যুগল নিঃক্ষেপ করলাম উর্দ্ধে। অলক্ষ্যে লক্ষ্য করলাম কক্ষের সাইনবোর্ড। না, ভুল করিনি। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষই বটে। দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে একবার ইচ্ছে হলো, উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করিঃ

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবির চীন........।"

কক্ষটিতে দ্রাবিড় জাতীয় বা *চৈনিক কোন লোকজন না থাকলেও দেখলাম, দেশোদ্ধারের একনিষ্ঠ সৈনিক আছে অসংখ্য। তারা সমুদয় আসন দখল করে নিবিষ্ট চিত্তে বিড়ি সিগ্রেট ফুঁকছেন, কেউবা হৃষ্টচিত্তে কেষ্টো আলাপ করছেন।

ওদের চাপে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে কিছু বিশিষ্ট যাত্রী এককোনে দাঁড়িয়ে অদৃষ্টকে দোষারোপ করছেন শিষ্টাচারের বিলুপ্তি হেতু।

আসন দখলকারী স্বয়ং সৈনিকেরা শংকর গোত্রীয়। অধিকাংশই বয়সে তরুণ, পেশায় টো টো কোম্পানী, নেশায় ইনকেলাব জিন্দাবাদ। সাথে আছে হরেক রকম নেতা, লীডার, ব্রোকার, হকার, টাউট ও চিট। চোরচোট্টাও যে দু'চারজন ঢুকে পড়েনি সুযোগ বুঝে তা হলপ্ করে বলা কঠিন। তবে যেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হলো – এরা অধিকাংশই বেয়ারিং পোষ্টের যাত্রী। রাত্রিকাল রেল কোম্পনীর ছত্রী সেনারা বোধ হয় নিরাপত্তার অভাব বোধেই অন্তর্হিত। কাজেই শ কি হাজার, হরিজন কি মহাজন, পকেটমার কি পঞ্চম জর্জ– সকলে একসাথে ঢুকে পড়লেই বা আটকাচ্ছে কে ?

বুঝলাম, সমতার ফাঁসে জড়িয়ে সভ্যতার শ্বাসরুদ্ধ হতে আর বিলম্ব নেই অধিক। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রথম শ্রেণীর আসন দখল করলেও কিছুটা যুক্তি থাকে। বলার থাকে– সমতার যুগে শ্রেণীবিন্যাস কেন ? কিন্তু আসলেই যে বিনাটিকেটের যাত্রী, সে যদি প্রথম শ্রেণীতে ঢুকে সমতার সৈনিক সাজে, তাহলে দৈনিক একবার করে গলায় দঁড়ি দেয়ার ইচ্ছে হবে না কার ?

আর দাঁড়িয়ে না থেকে পা দু'টো বাড়িয়ে দিলাম বিপরীত দিকে। এর পর দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, এমন কি শেডের নীচে শ্রেণীহীন শ্রেণী সিমেন্টের বেঞ্চি গুলোতেও খোঁজ করলাম ইঞ্চি কয়েক ভ্যাকান্সি, কোমর জুড়ানোর জায়গা। কিন্তু অদৃষ্টে ভোগান্তি থাকলে তা খন্ডাবে কে ? সর্বত্রই পাঁচজনের আসন একজনে দখল করে লম্বা হয়ে চোখ মুজেছেন এক একটা কুম্ভকর্ণ। একমাত্র বোম্বিং ছাড়া ওদের বিন্দু পরিমান নড়ানো সম্ভব নয়।

আসনের আশা নির্বাসিন দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আনমনে হাঁটতে লাগলাম নীল আকাশের নীচে। কিন্তু সবই মিছে। সর্বত্রই সংকট। শীতের রাত। শিরশিরে উত্তুরে বাতাস হুহু করে ছুটছে হাড় হাড্ডির সন্ধানে। হন্যে হয়ে ছুটে এসে কামড় ধরছে হাড়ে। আমার খদ্দরের আলোয়ান খানিকক্ষণ পালোয়ান মাফিক পাল্লা দিয়ে কল্লাকাটা দারোয়ান মাফিক ছেড়ে দিল গেট। আমাকে সঁপে দিলো আল্লাহর হাতে। এর উপর আবার নিশির শিশির। শুধু পাতায় পাতায় পড়ছেনা, আমার মাথায়ও পড়ছে সমানে। বুঝলাম, অচিরেই শেডের নীচে না গেলে, হাসপাতালের বেডের উপর থাকতে হবে দীর্ঘদিন। কাজেই ফিরতে হলো। ফেরার পথে জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, " এগারোটার ট্রেন কটায় আসবে বলতে পারেন ?"

বইঘর.কম ও রোকন

গাল ভর্তি তাম্বুল রসের ঢোক গিলে ভদ্দর লোক বললেন, " ওটা নটাতে চলে গেছে"।

ভদ্দরলোক চুন পুরলেন মুখে। মুখ চুন হলো আমার চোখ কপালে তুলে বল্লাম - বলেন কি। এত এ্যডভান্স ?

-মানে ? - গাড়ীতো বরাবর লেটেই যায়। এটা আগেই গেলো ?

-আগে ? দিন এগারোটার গাড়ী গেল রাত নটায়, তবু বলছেন - আগে ?

গড সেভ দি পাবলিক। ধড়ে প্রাণ এল। বললাম, না না। আমি ও ট্রেনের কথা বলছিনে। বলছি– রাতের ট্রেনের কথা।'

– ও যেটা রাত সাড়ে এগারোটায় ছাড়ার কথা ?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, কটা নাগাদ আসতে পারে ওটা ?

– এখনই ? সবোতো বারোটা বাজে। আর একবার বারটা বাজুক।

বরাতের জোরে আরো বারো ঘন্টাধরে প্লাটফরমের দৈঘ্য প্রস্থ্ জরিপ করতে হলোনা। রাত দু'টোর দিকেই চলে এলো সাড়ে এগারোটার ট্রেন। ভূতের বিশেষ দূত– লোকাল বিদ্যুতের বিদঘুটে আলোতে মনে হলো, জমিন থেকে হাত খানেক উপর দিয়ে ফার্লং খানেক লম্বা একটা নরদেহের গাইট হুশ হুশ করে এগিয়ে আসছে আঁকাবাঁকা পথ ধরে। গাড়ীর উপরে, নীচে, দরজায়, জানালায়, হাতলে, পাদানে- সর্বত্রই মানুষ। মৌমাছির চাক দেখেছি। মানুষের চাক দেখিনি। আজ দেখলাম। কামরাগুলোর ভেতরের খবর জানিনে। তবে মানুষের বদলে সেগুলো তরল বা বায়বীয় পদার্থ পূণর্ন হলেও আতঙ্কের কারণ নেই। কারণ, একবিন্দু বেরিয়ে আসার ফুটো নেই কোথাও।

হতাশ হয়ে ছেড়ে দিলাম হাত পা। ভাবলাম, নিজের তো নয়ই, অন্য কারো আর চান্স নেই এ ট্রেনে। এই যে সারি সারি যাত্রী, গাড়ীর আশায় ধৈর্য্যের উপর বাঁশগাড়ী করে চেয়ে আছে পথের পানে, মাথায় লাঠির বাড়ি মারলেও এদের পাড়ি জমানো সম্ভব নয় গাড়ীয়াল ভাইয়ের। কিন্তু গাড়ীয়াল ভাইকে করতে হলোনা কিছুই। নিমেষে ভুল ভাঙ্গল আমারও। গাড়ি এসে প্লাটফরমে ইন করতে না করতেই, এই নেতিয়ে পড়া জনতা, জীনে ধরা রুগীর মতো, তিনলাফে লাফিয়ে উঠে, যে সীন ক্রিয়েট করলো. তা দু'দন্ড দেখার মতো। জলোচ্ছাসের বেগে সকলে এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো ট্রেনের উপর। কাঁপিয়ে তুললো মেদিনী, ফাঁপিয়ে তুললো পরিবেশ। বিকট চিৎকার, আর্তনাদ ও হৈ হুল্লোরের মধ্য দিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

সুচাগ্র বিমুখ স্থানে, তারা হাতী ঢোকানোর পথ বের করলো পাশবিক বল প্রয়োগে। জাত শ্রেণীর বাত নেই। প্রথম শ্রেণী পূর্ণ হলো ঝাকা ঝুড়ি বস্তাওয়ালা যাত্রীতে। তৃতীয় শ্রেণীর হাতল ধরে ঝুলতে লাগলো অসংখ্য কোট প্যান্ট টাই।

সারভাইভাল অব দি ফিটেষ্ট' থিয়োরীর বিশুদ্ধতা প্রত্যক্ষ করলাম পলকহীন নেত্রে। অতঃপর পশ্চাতে পা বাড়ালাম নিজের অক্ষমতাকে লক্ষ বার অভিসম্পাত দিয়ে। কিছু সংখ্যক লোক তখনও ঘূর্ণিবায়ুর মতো ঘুরপাক খাচ্ছে চারদিকে। স্বাভাবিক হুঁশবুদ্ধির অনেক উর্ধ্বে এখন তারা। ওদের সাথে ধাক্কা খেয়ে আক্কাপাওয়ার সম্ভাবনা এড়িয়ে সরে এলাম ফাঁকে। আনমনে হাঁটতে লাগলাম রেলগাড়ীকে প্যারাল্যাল করে। রাতে আর ট্রেন নেই,. সাঁতারের উপর পানি নেই, কাজেই আর চিন্তা নেই-। ব্যোম কেদারনাথ। নিজেকে জগন্নাথের হাতে সঁপে দিয়ে গুণ গুণ করে গান ধরলাম-' "দীলমে চুপাকে পেয়ারকা তুফান লে চলে-"।

হুইসেলের তীব্র শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি, প্রায় ইঞ্জিনের কাছাকাছি এসে গেছি। সামনে আর দু একটি লাগেজ ভ্যান। লোকজনের ভীড় এদিকে খুবই কম অকারণে নয়, কারণে। এদিকের যাত্রীবাহি শেষ কামরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নৈকষ্য কুলিনদের কামরা। প্রায়শঃই রাইফেলধারী প্রহরী দ্বারা প্রটেকটেড কক্ষ। অবশ্য দরজায় সত্যি সত্যিই কয়েকটা রাইফেল দেখা না গেলে, ফেল মারতো প্রটেকশানের সমুদয় আয়োজন- কুলিনদের কৌলিন্য চার চৌদ্দং ছাপান্ন বার বিপন্ন হতো সমাজতন্ত্রের স্বয়ং সৈনিকদের হাতে। নীতির পরোয়া কেউ করুক আর না করুক,. লাঠীর পরোয়া ভূতেও করে। কাজেই, এদিকে কারফিউ।

www.boighar.com

আর একটু ভাল করে চাইতেই যা চোখে পড়লো , তাতে চোখদু'টো মুছে নিয়ে দেখতে হলো আবার। ঐ কুলীন কামরার এক কক্ষ পরেই আর একটি যাত্রীবাহী ক্ষুদ্রকায় কামরা। প্রথম শ্রেণীর মার্কা সুস্পস্ট তার গায়ে। এতক্ষণ বন্ধ ছিল কামরাটি। রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে এই মাত্র চাবিওয়ালা সরে যাচ্ছেন অন্যত্র। বিন্দুমাত্র গাফিলতি না করে দৌড় দিলাম সেইদিকে। কক্ষের কাছে পৌঁছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভেতরে কেউ নেই থাকার কথাও নয়। বাইরেও কেউ নেই হাত বিশেকের মধ্যে। থাকার মধ্যে দ্বারপ্রান্তে এই বিভ্রান্ত আমি, আর অভ্যন্তরে ঐ সম্ভ্রান্ত আসন। সাত আটজনের আরামে বসার মতো অভ্রান্ত ব্যবস্থা। মরুর মধ্যে এ যেন শুধু মরুদ্যানই নয়, ব্যাবিলনের শূন্যদ্যানের চাইতেও বিস্ময়কর বস্তু। সিঁড়ি যুক্ত বৈকণ্ঠের বাগান। অবগুণ্ঠন মুক্তা অপ্সরীযোগও আর বুঝি বিচিত্র নয়। গায়ে চিমটি কেটে দেখলাম, না, স্বপ্নও নয়, সিদ্ধি বাবার আকর্ষণও নয়। বিলকুল হুঁশেই আছি। হুঁশ হুঁশ করে ছেড়ে দিলো গাড়ী। হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম আনন্দে।

বইঘর.কম ও রোকন

চিচিং ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে অজস্র মনিমুক্তা দেখে আলীবাবার অগ্রজ কাশেম আলীর মুন্ডুটা কপাক ঘুরেছিল, তা বলতে পারবো না। দিশেহারা হয়ে ঐ মনি মুক্তার উপর সে কগোন্ডা ডিগবাজি খেয়েছিল, তাও আমার জানা নেই। কিন্তু এই বাদুর ঝোলা ট্রেনে লাট বাহাদুরের মান পেয়ে আমার অবস্থা হলো তার চেয়েও শোচনীয়। এতবড় আসন জুড়ে নিজেই বসবো, না আসনটাকেই নিজের উপর বাসবো- কিছুই স্থির করতে পারলাম না প্রথমতঃ। থতমত করতে করতে জুতাসমেত সাস্টাঙ্গে পড়ে গেলাম গোটা আসন জুড়ে।

পরক্ষণেই ঘুরে গেল মাথা। একটু দূরে কলকন্ঠের মধ্যে যে কথা কানে পড়লো, তাতে গুড়ে আমার বালী পড়লো রাশি রাশি। গাড়ির বেগ তখনো বাড়েনি। আবেগের সাতে জনৈক ব্যক্তি বলছেন,' এইযে, কোথায় ছিলেন আপনারা এতক্ষণ ? দুয়ার খুলে দিয়ে আমি আপনাদের খুঁজে খুঁজে হয়রান। উঠুন উঠুন। চটপট উঠে পড়ুন। কামরাটাতো রিজারভেশানেই আছে, কিন্তু টাইমটা তো তা নেই। সময় হয়ে গেলে গাড়ী তো ছাড়তেই হবে।'

মস্তকে বজ্রপাত। বুঝলাম, স্বর্গচ্যুতি আসন্ন। আসনতো ছাড়তে হবেই, অদৃষ্ট প্রসন্ন না হলে কক্ষটাও ছাড়তে হবে বিপন্ন অবস্থায়। ধরমড়করে উঠে চুপ করে বসে রইলাম আসনের এক কোণে। মনে তখন অবিরাম ইস্টনাম।

পড়িমরি করে যারা গাড়িতে উঠলেন- তারা সাকূল্যে সাতজন। পাঁচজন মহিলা আর দুইজন পুরুষ। বয়সের মারপাঁচে পুরুষ দু'টো নেহাতই পোশমানা জীব-হার্মলেস বিয়িং। একজন অশতিবর্ষের বৃদ্ধ, অন্যজন অষ্টম বর্ষের বালক। কিন্তু মহিলারা পাঁচজনই পাঞ্জা লড়ার যোগ্যা। বিশ থেকে চব্বিশের যুবতী। প্রগতির যুগ না হলে আমার দুর্গতির ভয় ছিল না। কিন্তু এ যুগের যুবতীরা শুধু লজ্জাবতীই নন, লড়কে লেঙ্গেও বটেন। এঁদের হাত মুখ সমানেই চলে। খানিক পরেই বুঝলাম দলের এরাই সেনাপতি, এরাই সারথি। পুরুষ দুটো নেহাতই পোষাকী সঙ্গী।

চলন্ত গাড়ীতে উড়ন্ত শাড়ী নিয়ে রাত্রিকালে ওঠা, একটা দুরন্ত ব্যাপার বৈকি? তার উপর কাঁধে এই ঝুলন্ত বালক ও বৃদ্ধ। কাজেই নিজেরা উঠতে, অন্যকে উঠাতে এবং যাঁরা পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তাদের টা টা জানাতে এতক্ষণ ব্যাস্ত ছিলেন এঁরা। কক্ষের অস্পষ্ট আলোতে আমি ছিলাম দৃষ্টির বাইরে। শুভদৃষ্টির দন্ডেই অনাসৃষ্টি কান্ড। পেছনে ফিরে আমার দিকে চেয়েই ভুত দেখার মতো সকলে চমকে উঠলেন একসাথে, লাফিয়ে উঠলেন এক সাথে, কথা বললেন এক সাথে। চোর ডাকাত গুন্ডা বদমায়েশ পাগল মাতাল এবম্প্রকার সকল বিশেষণ

বইঘর.কম ও রোকন

এক নিঃশ্বাসে শেষ করে, বীরাঙ্গনার বেশ ধরলেন তাঁরা। ধেয়ে এলেন কয়েক ধাপ সামনে। আসন ছাড়া ইতিমধ্যেই হয়েছি। এবার ইচ্ছা হলো, ঐ জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে শুধু কামরা ছাড়া নয়, এই ছন্ন ছাড়া জীবনটার এখানেই ইতি টেনে, একেবারে বিশ্বছাড়া হই। সাফ হোক ট্রেসপাশের পাপটুকু। নারী নির্যাতন নিঃসন্দেহে হেয় কাজ। কিন্তু তাই বলে নারীর হাতে নির্যাতিত হওয়াটাও এমন কোন শ্রেয়ঃ কাজ নয়। তার চেয়ে মৃত্যুবরণ শতগুণে শ্রেয়ঃ।

কিন্ত ওঁদের অস্থিরতায় স্থির করতে পারলাম না কিছুই। কথা বলারও ফাঁক পেলাম না কিছুক্ষণ। একজন অবিরত টিপতে লাগলেন বাল্ব বিহীন দ্বিতীয় দীপের সুইচ। আরো আলো চাই তাঁর। অন্যজন হাত দিলেন চেনে। ট্রেনের গতি থামিয়ে আমাকে টেনে নামিয়ে দিয়েই থামবেন উনি, না পুলিশের চেন পর্যন্ত পৌঁছাবেন– তা উনিই জানেন। তৃতীয় জন মুখ বাড়ালেন বাইরে। কাউকে না দেখে আমাকেই দেখতে লাগলেন পলকহীন নেত্রে। চতুর্থ জন এগিয়ে এলেন আরো একধাপ। কি তাঁর অভিপ্রায়– আল্লাহ মালুম।

কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টে দিলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। বৃদ্ধ হলেও পুরুষ, অথর্ব হলেও সিংহ। এদের ধাতই আলাদা। নারীরা হাঁড়ি ফেলে খবরদারী করার জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি যে যুক্তিই দেখান, প্রগতির পোস্টাই খেয়ে সমতার পোষ্টার নিয়ে যত হাত-মুখই নাচান, সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে, বাই নেচার এঁরা আনাড়ী। ক্ষতি কিছু হোক না হোক,. আরশোলা বা জোঁক দেখে এলোপাথাড়ী লাফানোর ঝোঁকটা এঁদের মজ্জাগত।

তিনি ছোট্ট একটা ধমক দিয়ে বললেন, "আহ! তোরা থামতো। নেক্স্ট স্টেশন দূরে নয়। আগে দেখি ব্যাপারটা কি" লাঠিতে ভর দিয়ে ভদ্দরলোকটি এগিয়ে আসতেই ব্যস্ত ভাবে বললাম, "দেখুন, আমি গুন্ডা-পান্ডা কিছুই নই। নেহাতই একজন গোবেচারা যাত্রী। কোথাও ঠাঁই না পেয়ে এই রাত্রিকালে হঠাৎই উঠে পড়েছি এখানে।"

কিন্তু পরিস্থিতি মোড় নিলো অন্যদিকে। এতে আতংক হ্রাস হলো ওদের, অশান্তি বৃদ্ধি হলো আমার। নেহাতই গোবেচারা জেনে জনৈকা ভারিক্কিচালে প্রশ্ন করলেন, "তা কেন উঠবেন? এটাতো বিজার্ভ করা কামরা।"

বললাম, "সেটা আমি জানতাম না।"

– লেখাপড়া তো জানেন কিছু?

– হ্যাঁ তা কিছু কিছু জানি।

– বাইরে যে রিজারভেশন স্লিপটা ঝুলছে, সেটা চোখে পড়েনি?

বইঘর.কম ও রোকন

–ব্যস্ততার মধ্যে আমি ওটা লক্ষ্য করিনি।

– এটা যে ফার্স্টক্লাশ, তাও কি লক্ষ্য করেননি?

– হ্যাঁ, তা দেখেই উঠেছি।

– উঠলেন কোন সাহসে?

–মানে?

– ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট আছে?

– আছে।

দেখালাম টিকেট। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচায়ী করতে লাগলেন সকলে। খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন আমার এই উস্কোখুস্কো চোহারা। পরে একজন প্রশ্ন করলেন, "নামবেন কোথায়?"

– মধুগঞ্জে।

– মাই গড, এ যে অনেক দূরের পাল্লা।

– হ্যাঁ, সকাল আট ন'টার আগে গাড়ীওখানে পৌঁছবেনা।

– টিকেটটা কি নিজের পয়সায় কেনা?

– না পার্টির পয়সায়।

– তাই বলুন। এত পয়সার টিকেট। পার্টির পয়সায় না হলে এমন কান্ড সম্ভব হয় কি করে।

–মানে?

খামাখা এত পয়াসা নষ্ট করলেন কেন? আপনাদের তো জানি টিকেটই লাগে না।

– টিকিটই লাগে না!

– রাজনীতির পান্ডারা আবার টিকেট করে কবে?

– আপনি ভুল করছেন। আমি সে পার্টির কথা বলছিনে।

–তবে?

www.boighar.com

– আমি বলছি যাত্রা পার্টির কথা। যে পার্টি আমাকে তাদের কাজে ডেকেছিল, তারাই কিনে দিয়েছে এ টিকেট।

– তার মানে। আপনি যাত্রা পার্টির লোক?

– তা– মানে, হ্যাঁ, কতকটা তাই।

– যাত্রা করে বেড়ান?

– হ্যাঁ, তাও মাঝে মধ্যে করি বৈকি।

– যাত্রা পার্টির লোকও ফার্স্ট ক্লাশে যাতায়াত করে?

– কেন, নিষেধ আছে ?

–তা না থাক, তারা তো জানি সব বাউন্ডেলে, বেকার। এত পয়সা পাবে কোথায় ?

– যারা পায়, তারা যায়।

– আশ্চর্য। এমন তো শুনিনি। না, ক্লাশটার আর কোন গ্রাভিটি থাকলো না।

এরপর আর কথা বলা যুক্তিহীন। নীরবে নামিয়ে নিলাম চোখ। কিন্তু হঠাৎ এক স্বগোক্তি কানে পড়ায় চোখ তুললাম আবার। দেখলাম অনেকটা ফাঁকে দন্ডায়মান একটা মেয়ে, অর্থাৎ পঞ্চম মেয়েটি, বিশেষ বিরক্তির সাথে চাপা কণ্ঠে বলছেন, "ছিঃ এদের সাথে পথ চলাও বিপদ কখন যে কি বলে।"

এ মেয়েটি শান্ত ছিলেন আগা গোড়াই। এক পাশে দাঁড়িয়ে আমার গতিবিধি একদৃষ্টে লক্ষ্য করা ছাড়া তেমন কিছুই করতে দেখিনি তাঁকে। তাঁর কথা শুনে রুষ্ট হলেন প্রশ্ন কর্তী। বললেন, "কি বললিরে হেনা ?"

বোঝা গেল মেয়েটির নাম হেনা। তা রেহামাই হোক, আর হাস্না হেনাই হোক। হেনা এবার চাপা অথচ শক্তকণ্ঠে বললেন, "তুই একটা কি ? তোর মুখে কোন লাগাম নেই ?"

একটু ভড়কে গেলেন প্রশ্নকর্তী। "বললেন, তার মানে ?"

হেনা বললেন, কত চোর বাটপার টিকেট ছাড়াই ফার্স্ট ক্লাশে যাচ্ছে। টিকেট করে একজন যাত্রাপর্টির লোক গেলে ফার্স্টক্লাশের গ্রাভিটি নষ্ট হবে কেন ? এসব কি বাজে বকছিস ?

ভেজ মওলা। আমাদের জন্যও কিছু সহানুভুতি এ দুনিয়ায় আছে। একেবারেই স্রোতের পানা নই। প্রতিবাদ না করে প্রশ্নকর্তী এবার কটাক্ষপাত করলেন। বললেন, ও-ম্মা খাইছেরে। "ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে অন্যের দিকে চাইলেন– হাসতে লাগলেন মুখচেপে।

প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে আমি নরম কণ্ঠে বললাম, "দেখুন, না জেনে উঠে পড়েছি। আর নামার উপায় নেই। আপনারা বসুন। আমি নেক্স্ট স্টেশনেই নেমে যাবো।"

বৃদ্ধ ভদ্দর লোকটি বসতে বসতে বললেন, হ্যাঁ, "হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছি। তোরা আয়তো দেখি, সব বসে পড়। উনি হঠাৎ যখন উঠেই পড়েছেন, তখন নেকস্ট স্টেশান না এলে আর লাফিয়ে লাভ আছে ? তাছাড়া একজন ফার্স্টক্লাশ যাত্রী কোথাও স্থান না পেয়ে এখানে উঠে পড়েছেন। এতে এতো ব্যস্ত হবারই বা আছে কি ?"

বইঘর.কম ও রোকন

নিতান্তই সত্যি কথা। এবার তারা রণেভঙ্গ দিয়ে অঙ্গ এলিয়ে দিলেন আসনে। ত্রিভঙ্গ আকারে এক একজন বসতে লাগলেন দু'তিনজনের আসন জুড়ে। আবার রুষ্ট হলেন হেনা। "বললেন, এই বেলী, তোরা একটু সোজা হয়ে ঐ দিকে সরে বসতো।"

বেলীই সেই প্রশ্নকর্ত্রী। এদের মধ্যে সব চেয়ে মুখরা। অনেকটা ঠোঁট কাটাও বটেন। বিন্দুমাত্র না নড়ে বেলী বেগম বললেন, "কেন, দাদুর পাশে অত জায়গা, তবু তোর হচ্ছে না ?"

হেনা বললেন, "না। তোরা ঐ দিকে চেপে বস। দাদু এইদিকে একটু সরে এলে, ও ভদ্রলোকও বসতে পারবেন।"

হেনা বললেন নির্বিকারে। শুনে বিকারগ্রস্ত হলেন অন্যান্য সকল মেয়ে। সকৌতুক বিস্ময়ের সাথে শুরু হলো ফিসফাস, ঠেলাঠেলি ও চাপা হাসি। পার্শ্ববর্তিনীকে একটা মৃদু ঠেলা দিয়ে বেলী চাপা কণ্ঠে বললেন, "মর্জ্জিনারে, এবার সামলা। মর্জ্জিনা বিবি কপট খেদে বললেন, কি করে আর সামলাই ভাই ? আমার দিকে আড়চোখে ইঙ্গিত করে বললেন, "চেহারাখান যে আসলেই পাগল করার মত।" তৃতীয় জন চতুর্থের কানে কানে বললেন, "কিছু বুঝতে পারছিস বিউটি ?" বিউটি একটা বিউটিফুল ইংরেজী বললেন, "লাভ এ্যাট দা ফার্স্ট সাইট।" হেনা দাঁতের উপর দাঁত পিষে বললেন, ছিঃ। তোরা মানুষ না কি ? আমরা সবাই বসে থাকবো আর একটা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকবেন– এটা কেমন দেখায় ?" কিন্তু কথাটা মোটেই গায়ে মাখলেন না তারা। বেলী ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, "তা যেমন দেখায় দেখাক। অত চাপা চাপি করে বসতে পারবোনা বাবা। লং জার্নি।"

চাপা কণ্ঠে তাদের মধ্যে কথা হলো আরো। এক কোণে দাঁড়িয়ে আমি এই টুকুই উদ্ধার করলোম কোন মতে। বৃদ্ধটিও একটা ব্যর্থ সুপারিশ করলেন আমার বসা নিয়ে। সব কিছুই নাকোচ করে তারা মগ্ন হলেন রসালাপে। নীরব হলেন ভদ্রলোক। বিষন্ন বদনে বসে রইলেন হেনা।

হেনা। মাঝারী গড়ন। না গোল না লম্বা মুখমন্ডল। শান্ত ও সুশ্রী। গায়ের রং উজ্জল। এলা মাটির প্রলেপ নেই বসনে। রং এর আধিক্য নেই বসনে। মাথার চুলগুলো নকল না আসল, এই রাত্রিকালে বলা কঠিন। আসল হলে, রীতিমতা গর্বের বস্তু। মেয়েটি যে অসামান্য রূপবতী সন্দেহের অবকাশ নেই তা নিয়ে। যা তার ত্রুটি, তা হলো রূপটাকে তুলে ধরার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই মেয়েটার। বরং সে দিক দিয়ে ঐ বেলী বিউটিরাই শতগুণে এ্যাকটিভ। রঙ্গীন বসনে ও পুরুষ্টু প্রসাধনে তারা দপদপ করে জ্বলছে এই আলো আঁধারের মাঝেও। হঠাৎ করে চাইলে চোখে পড়ে এরাই আগে। একটু ভাল করে চাইলেই, এরা নিভে যায় দপ

বইঘর.কম ও রোকন

করে। দপ দপ করে জ্বলতে থাকেন হেনা। এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি যাকে, এবার একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম তাকেই।

খানিক পরে বৃদ্ধটি প্রবেশ করলেন বাথরুমে। বেরিয়ে আসার পথে কিছু কথা হলো তার সাথে। যা জানলাম তা হলো এক উচ্চপদস্থ রেল কর্মচারীর মেয়ে ঐ হেনা। ঐ ছোট্ট ছেলেটি ঐ কর্মচারীর ছেলে। মেয়েরা সবাই ভারসিটির ছাত্রী। হেনার বান্ধবী। একই সাথে পড়ে। হেনাই এদের সাথে করে এসেছিলেন বাপের কাছে বেড়াতে। সাথে করেই নিয়ে যাচ্ছেন গায়ের বাড়ি। বৃদ্ধটি হেনার আব্বার গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয়। সাথে যাচ্ছেন মুরুব্বী হয়ে। এ ভয়েসলেস মুরব্বী-টিটুলার হেড।

পরে বুঝলাম, শুধু এই বৃদ্ধের উপরে ভরসা করেই রাত্রিকালে মেয়েদের পাঠাননি হেনার আব্বা। এদের গার্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব গাড়ির গার্ড ও চেকারদের গর্দানে। সোজা কথা নয়। বড় সাহেবের মেয়ে যাচ্ছেন গাড়িতে। পথে বিপদ হলে, পদ নিয়ে টানাটানি শুরু হবে সবার।

ছোট্ট ছেলেটি উটুস পুটুস করতে করতে উঠে এলো জানালার ধারে। রুদ্ধ জানালা দিয়ে বর্হিদৃশ্য অবলোকনে ব্যর্থ হয়ে আমার এই উড়নচন্ডী চেহারাটাই দেখতে লাগলো একমনে। খানিক পরে হেলে দুলে দেখতে লাগলো আমার এই পেটমোটা সাইড ব্যাগের আয়তন। তার শংকিত আচরণে বুঝলাম, পাগল দেখার পুলক একবিন্দুও নেই তার অন্তরে। যা আছে, তা সব টুকুই ছেলে ধরা রাহাগীরের আতংক। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কি খোকা?" কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে চেয়ে রইল ছেলেটি। হাসতে হাসতে বললাম, "নাম বলতে দোষ কি খোকা ? বলো না "এবার সে প্রতিবাদ করে বললো, আমার নাম খোকা নয়।"

– তবে ?

– টাইগার।

– ওরে বাসরে। একদম টাইগার ?

– হ্যাঁ।

– টাইগার মানে কি ?

– বাঘা।

– বাঘা না বাঘ ?

–না না, বাঘা। গায়ে গেলে সবাই আমাকে বাঘা বলে ডাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

– তাই বলো। তা তোমাদের গায়ের নামটা কি ?

– বাঘাবন।

– সর্বনাশ বলো কি ? ওখানে বুঝি অনেক বাঘ আছে ?

– ধ্যাৎ,। ওগুলো বাঘ নয়, শেয়াল। দিনের বেলা দূরে লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলা গায়ের উপর আসে। কিন্তু কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেই আবার ভোঁ দৌড়।

ভোঁ করে বেজে উঠলো হুইসেল। গাড়ীর গতি কমতে লাগলো ক্রমেই। বুঝলাম, নেক্স্ট স্টেশান সন্নিকট। খানিক পরেই ট্রেন এল স্টেশানে। গাড়ী মোশানে থাকতেই খুলে দিলাম জানালা। ছ্যাত করে এক ঝলক ঠান্ডা লাগলো মুখে। বাইরের দিকে চাইতেই ছ্যাঁৎ করে চুপসে গেলো বুক খানাও। লোকে লোকারণ্য। আগের স্টেশানের চেয়েও অবর্ননীয় অবস্থা। ওখানে তিল ধারণের ঠাঁই ছিলনা শুধু ট্রেনেই। এখানে তিল ধারণের ঠাঁই নেই স্টেশানটাতেই। যেন আকস্মিক প্লাবনে ডুবে গেছে পৃথিবী, জেগে আছে শুধু এই স্টেশনটা। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই প্রচন্ড ভীড়ের কারণ স্থানীয় এক প্রকান্ড হাট। এই স্টেশানটাই হাটুরেদের আগমন ও নিষ্ক্রমনের গেট, ট্রেনটাই আপ-ডাউনের বোরাক।

বুকটা ধড়াক করে কেঁপে উঠা সত্ত্বেও ট্রেনটা থামতেই হাসিমুখে বললাম, "ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের। এবার আসি–।"

কিন্তু সকলই গরল ভেল। কারো আর নজর নেই আমার দিকে। বাইরে তখন হুলুস্থুল কান্ড। গাড়িতে চড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি প্রক্রিয়াটা মারামারি ছাড়িয়ে এখন মহারণে পরিণত। আবাল বৃদ্ধবনিতা একবিন্দু ভনিতা না করে প্রকাশ্যে মল্ল যুদ্ধে নিয়োজিত। দলিত মথিত আশরাফউল মাখলুকাতের করুণ আর্তনাদে দশদিক মুখরিত। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে এই প্রমত্ত দৃশ্যের দিকে তারা সকলেই চেয়ে আছেন দম বন্ধ করে। ভুলে গেছেন নিজেদের অস্তিত্ব। এমতাবস্থায় এই অধমের বিদায় সম্ভাষণ তো দূরের কথা, ডংকার গর্জনও যে এঁদের শ্রবনে পশিবে না – তা প্রায় হলফ করে বলা য়ায়। কাজেই, অযথা কালক্ষয় না করে চলে এলাম দরজার কাছে। হাতলে হাত দিতেই কানে এল এক সন্ত্রস্ত প্রতিবাদঃ "ও কি ? কি করছেন?"

পিছন ফিরে দেখি কথা বলছেন হেনা। তাঁর চোখে মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। যেন কোন জন্মের কে তিনি আমার। ম্লান হাসি হেসে বললাম, নেমে যাচ্ছি।

– মানে ?

– নেক্স্ট স্টেশানে এসে গেছি যে।

– অন্য কামরায় উঠতে পারবেন ?

– তেমন সম্ভাবনা আদৌ নেই।

– তবে ?

– রাতটা প্লাটফরমে কাটাতে হবে। দিনের বেলা গাড়ী এলে আবার চেষ্টা নেবো।

– সেকি।

– শুধু হেনাই নন, এবার একসঙ্গে চমকে উঠলেন সকলেই। বাইরের ঐ নিদারুণ দৃশ্য দেখে বেমালুম বদলে গেছেন এঁরা। ভুলে গেছেন ইতিপূর্বের পরিবেশ ও সম্পর্ক। তদুপরি আমি এখন ঐ অগণিত কে বা কাহারার একজন নই, খানিকটা চেনা জানা এঁদের। সহচার্য জনিত সহানুভূতির কিঞ্চিৎ হকদার। তাই এই সেকি শব্দ দ্বারা হেনার উৎকণ্ঠাকে সমর্থন দিয়ে আমার প্রতি প্রত্যক্ষ সহানুভূতি প্রকাশ করলেন তাঁরা। মর্জ্জিনা আর একটু যোগ করে বললেন, পাগল নাকি। বৃদ্ধ ভদ্দর লোকটি খানিকটা বিভ্রান্ত হয়েই প্রশ্ন করলেন, "এই প্রচন্ড শীতের মধ্যে সারা রাত টিকতে পারবেন স্টেশানে ?"

বললাম, "কি আর করবো বলুন, কপালে দুভোর্গ থাকলে সেটা এড়াবো কি করে ?"

বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়েছিলেন হেনা। বললেন,–"এখানে কি আপনার খুবই কষ্ট হচ্ছে ?"

– কেন, তা হবে কেন ?

– যদি তা না হয়, আপনি এখানেই থাকতে পারেন।

– কিন্তু আপনারা–

– আমরা আর যাই হই, অমানুষ নই। জেনে শুনে একজনকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতে পারিনে।"

উত্তরে কিছু বলার চেষ্টা করতেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন চেকার। হেনাকে লক্ষ্য করে বিনীত কণ্ঠে বললেন, – আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ? হেনা সংক্ষেপে জবাব দিলেন, "না, কোন অসুবিধে নেই।" চেকার সাহেব আশ্বস্ত হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ। "কোন চিন্তা করবেন না। আমরা আশে.পাশেই আছি।"

চলে যাচ্ছিলেন চেকার সাহেব। হঠাৎ আমার উপর নজর পড়তেই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন আবার। তেড়িয়া কণ্ঠে বললেন, "আরে, একি। কে আপনি ? এখানে কেন ?"

www.boighar.com

তাঁর চোখে বিশ্বের বিস্ময়। এত সতর্কতা সত্ত্বেও এমন দূর্ঘটনা তাঁর কল্পনাতীত। আমি কিছু বলার আগেই জবাব দিলেন হেনা, বললেন, "উনি আমাদেরই লোক। ও নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে।"

পাথর নেমে গেল চেকার সাহেবের বুক থেকে। এতবড় এ্যাকসিডেন্টে কোন

বইঘর.কম ও রোকন

যোগ্য কৈফিয়তই দিতে পারতেন না উনি। পাথর নেমে গেল আমার বুক থেকেও। আমার মুখের কোন উত্তরই সদুত্তর হতো না তার কাছে। নেমে গেলেন চেকার সাহেব। আমি বোকার মত সেই দিকে চেয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। গাড়ী ছেড়ে দেয়ার ধাক্কায় চমক ভাংল আমার। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠতেই হেনা ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, আর যাই করুন। চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দেবেন না যেন।" দেখি সবাইর চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। গাড়ীর বেগ বেড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আবেগটা যত বড়ই হোক, প্রাণটা যে তার চেয়েও বড়, এ জ্ঞান আমার তখনও টনটনে।

অতঃপর আসনে বসার স্বাভাবিক আমন্ত্রণ সত্বেও আমি সরে এলাম এককোণে। কারো অনুগ্রহের সুযোগ নিয়ে তার সাচ্ছন্দকে নিগ্রহ করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই ব্যাগের উদর থেকে একটা আধ ময়লা চাদর বের করে, তাদের বিশেষ আপত্তি সত্বেও, এক কোণে পেতে নিলাম আসন। যোগাসনে বসার মতো ঠ্যাং এর উপর ঠ্যাং তুলে শ্রীবুদ্ধ বরাবর হৃষ্টচিত্তে বসে পড়লাম প্রকোষ্ঠের দেয়াল ঘেঁষে।

এরপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। কিঞ্চিত বাৎ-চিৎ, টুকি টাকি কথা আর ঘুমের আবেশে একটানা মাথা ঠোকার কমপিটিশান। সারারাত ওরা বসে একে ঠুকলেন অন্যের মাথায় মাথা, আমি বসে মাথা ঠুকলাম দেয়ালে।

# দুই

মধুগঞ্জে নেমে নদীর ঘাটে বসে আছি নৌকার আশায়। লক্ষ্যস্থল পৈতৃক গ্রাম হাতিরবিল। সামনে পথ ছ'সাত মাইল। একটানা জলপথ– জার্নি বাই বোট। কিন্তু ঘাটে বেজায় ভীড়। মওকা বুঝে বোটম্যানরাও জোট বেধে বসে আছে চলতিভাড়া বয়কোট করে। মোটা অংকের নোট ছাড়া, গায়ের কোট খুলে দিলেও কোনদিকেই বোট ছাড়তে রাজী নয় মাঝিরা। অবশ্য, মওকা পেলে ফটকা মারে দালাল ফোড়েল সবাই, ওদের আর দোষ কি।

ভেবে দেখলাম, এই ভীড়ের মধ্যে অস্থির হলে, ভাড়ার অংকে স্থির হবে চক্ষুদ্বয়। কাজেই নিজেকে সংযত করে স্থির হয়ে বসে আছি ফাঁকে। বসে আছি ভীড়টা খানিক ফিঁকে হওয়ার অপেক্ষায়।

ফাঁকে এসে বসে আছি বটে, কিন্তু মনটা আমার ফাঁকা ছিলনা একটুও। ওটা তখন হেনার কথায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। নদীর ঘাটে বসে শুধু হেনার কথাই ভেবে যাচ্ছি অবিরাম। আমার এই যাযাবর মনটাকে বেশ খানিকটা বিকল করে

বইঘর.কম ও রোকন

দিয়ে গেল মেয়েটা। জেলা দু'টো পৃথক হলেও বাঘাবন তো বেশী দূরে নয় আপনার বাড়ী থেকে। আসুন না একদিন অল্পদিনের মধ্যেই। – আমার ঠিকানাটা শুনে ট্রেন থেকে নামার সময় বার বার করে এই কথাই বলে গেল হেনা। আমার গ্রাম হাতিরবিল বাঘাবনের আরো খানিক নিকটে। এটা জানলে আরো কি যে বলে বসতো জানিনে। এক অনির্বচনীয় দরদ ছিল তার আমন্ত্রণের মধ্যে। নেহায়েতই কোন ভদ্রতার সুর নয় সেটা। নয় কোন আকস্মিক আবেগের তাৎক্ষণিক অভিব্যাক্তি। সহমর্মিতার এক সাবলীল গতি ছিল সেখানে। ছিল প্রাণের এক অনাবিল পরশ।

নদীর ঘাটে বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম অনুক্ষণ। ভাবছিলাম সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হয়ে, এই উপেক্ষিত পথে ছিটকে এসে না পড়লে, হয়তো আরো বেশী অন্তরঙ্গ হতে পারতো মেয়েটি। অভাজন জেনেও এত উষ্ণ যার আমন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠিত জানলে হয়তো আরো অনেক বেশি ব্যক্ত হতে পারতো তার অনুক্ত অন্তর। কত বসন্তের আমন্ত্রণ এই ছন্নছাড়া জীবনের সৃষ্টিছাড়া ঔদাসিন্যে প্রতিবারেই ফিরে গেছে বিভ্রান্ত অবস্থায়। আজ এই অবেলায় এ কোন যাদুকাঠি বুলিয়ে গেল হেনা।

– "আপনি ফরহাদ আহমেদ না ?"

– নিজের নাম শুনে চমকে উঠে চেয়ে দেখি, ক্রাচে ভর দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছেন এক ভদ্রলোক। একটু লক্ষ্য করেই চিনতে পারলাম তাঁকে। চিনতে পেরেই চমকে উঠলাম আবার। ধড়মর করে উঠে দাঁড়িয়ে বিপুল বিস্ময়ে পাল্টা প্রশ্ন কললাম, "একি রুহুল আমিন সাহেব, আপনি আপনার এ অবস্থা।"

ম্লান হাসি হেসে রুহুল আমিন সাহেব বললেন, "হ্যাঁ ভাই, আমি এই বছর খানেক হলো হারিয়েছি পা'টা।"

রুহুল আমিন সাহেব বাড়ী কৈগ্রাম। আমার গ্রাম হাতিরবিল থেকে ন'দশ মাইল দুরে। একই স্কুলের ছাত্র আমরা। এঁর বাপ ছিলেন শিক্ষক আয় ছিল সামান্য। আই, এস, সি পড়ার সময় মারা যান এঁর বাপ। ইনি মেসিনম্যানের চাকরী নিয়ে চলে যান এক মিলে। প্রায় একযুগ আগের কথা। তার পর এই আজ দেখা।

আমিন সাহেব পেছনে ফিরে ডাক দিলেন, "নাদিরা, এদিকে আয়। এই যে ইনিই সেই ফরহাদ আহমেদ।"

সামনে এসে দাঁড়াল এক যুবতী। তার দিকে চেয়েই ভুলে গেলাম স্থান কাল

বইঘর.কম ও রোকন

পাত্র। চেয়ে রইলাম অনিমেষ নেত্রে। একি মারাত্মক রূপ। যেন রূপ কথার রাজকন্যার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। যেমনি বরণ, তেমনি গড়ন। হেনাও রূপবতী। তার রূপে আছে স্নিগ্ধতা। কিন্ত এর রূপ কথা কয়। ভালকরে না চাইলেও চোখে এসে ছিটকে পড়ে মধ্যাহ্নের সূর্য্যের মতো। সম্বিত ফিরে পেতেই চেয়ে দেখি প্রায় অর্দ্ধেকটা ইস্টিশনের দৃষ্টি এই দিকেই নিবদ্ধ। ক্রাচে ভর দেওয়া লোকটি একটা উপলক্ষ্য হলেও, এই লক্ষীছাড়া রূপটাই লক্ষ্যবস্তু সবার।

পরিচয় দিলেন আমিন সাহেব। বললেন, "আমার বোন নাদিরা- নাদিরা আমিন। চিনতে পারলেন না ? ঐ যে লদেরা বলে ঠাট্টা করায় আপনার শাদা জামাটা লেপটে ছিয়েছিল কালী দিয়ে ?"

স্মরণ হলো। স্কুল থেকে ওদের বাড়ী বেড়াতে যাই একদিন। আর সেই দিনই ঘটে এই ঘটনা। এই মেয়ে সেই মেয়ে। একেই বলে- মর্নিং শোজ দি ডে। শিশু কালের সেই সুস্পষ্ট আভাস যৌবনে আজ ষোলকলায় প্রস্ফুটিত। ব্যস্ত কণ্ঠে বললাম, "হা হা তাইতো। আরে লদেরা-তুমি।" হেসে ফেললো মেয়েটি। সালাম দিলো হাত তুলে।

আমিন সাহেব বললেন, "আপনার সঙ্গে দেখা করতেই বেরিয়েছি আমরা। বাড়ীর কাজটুকু সেরেই হাতিরবিল যাবো আপনার কাছে, এই আমাদের পরিকল্পনা।"

বললাম, আমি তো আর হাতিরবিল থাকিনা এখন। গায়ের বসত প্রায় তুলে দিয়ে শহরের বাড়ীতেই পার হয়েছি পুরোপুরি।

তাই নাকি! না জানলেতো হয়রান হতাম খুব ? তা কোনদিকে যাবেন এখন ?

– হাতিরবিলই যাবো । একটু কাজ আছে গায়ের বাড়ীতে।

– আচ্ছা! তা যেতে কি দেরী আছে আপনার ?

– না, এখনই যাবো। কিন্তু আপনার এই অবস্থা ?

একটা করুণ হাসির রেখা টেনে আমিন সাহেব বললেন, "রাস্তাতো একটাই। যদি বিশেষ আপত্তি না থকে, চলুন না, এক নৌকাতেই যাই। যেতে যেতেই বলবো সব।

– বললাম চলুন।

বেশী ভাড়া পেয়ে এক মাঝি নাও ছাড়লো তখনই। যেতে যেতে রুহুল আমিন সাহেব যা বললেন তা হলোঃ

বইঘর.কম ও রোকন

মিলের চাকরিতে জয়েন করেই আমিন সাহেব মা বোনকে নিয়ে যান বাসায়। নাদিরাকে ভর্তি করেন মীলের স্কুলেই। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতেই নাদিরাময় হয়ে যায় স্কুলের প্রাঙ্গণ আর মীলের অঙ্গন। অসামান্য খ্যাতি ছড়ায় নাদিরার। লেখাপড়ায় যতটা নয়, তার শতগুণে অধিক রূপ ও অন্যান্য পারদর্শিতায়। অভিনয় আর আবৃত্তিতে অতি দ্রুত দক্ষতা অর্জন করে সে। স্কুলের অনুষ্ঠানে অল্প কিছু অভিনয়ের পরই তার ডাক পড়ে মীলের নাটকে। উর্ধতন কর্মকর্তার অপরিসীম উৎসাহে পর পর কয়েক বছর সে অংশ নেয় মীলের অনুষ্ঠানে। সংশয়হীন নিপুণতার মাধ্যমে সে সবাইকে মুগ্ধ করে নায়িকার ভূমিকায়। প্রতিবারেই পুরস্কার পায় প্রচুর, প্রশংসা পায় আশাতীত। এতে করে সে প্রতিবারেই বৃদ্ধি করে অগণিত শুভাকাঙখী, হরণ করে অনেকের সুকনিদ্রা। ফলাফল চিরাচরিত। জমে উঠে ভীড়। চুনোপুটির সাথে অনেক রুইকাতলাও পাতলা হয়ে ভাসতে থাকে নাদিরার প্রেম সাগরে। এই সময় মারা যান তার মা। মাথার উপর থেকে নেমে যায় আচ্ছাদন। শূণ্য গৃহে নিরাপত্তার অভাব ঘটে নাদিরার। বেড়ে চলে উৎপাত। নামে ও বেনামে পড়তে থাকে প্রেমপত্র। আসতে থাকে ঘটক। নিরূপায় হয়ে দূর থেকে এক সম্পর্ক এনে একদিন নাদিরার বিয়েটাই দিয়ে দেন আমিন সাহেব। নাদিরাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হন তিনি।

কিন্তু নাদিরার রূপটাই হলো তার কাল। বিয়ের পক্ষকালের মধ্যেই মাতাল স্বামীর লম্পট সঙ্গীদের বক্ষবিদীর্ণ করলো তার বিমোহিনী রূপ। ফলে এক গভীর রজনীতে সুরাপাত্র হাতে স্বগৃহেই নিহত হয় অপদার্থ স্বামী। আর দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে অসহায়া স্ত্রী। প্রাণপণ সংগ্রাম করে সম্ভ্রম রক্ষা করলেও নাদিরার শেষ রক্ষা হয়না। ধর্ষিতার অপবাদে অশেষ নিগ্রহ ভোগের পর তাকে ভাইয়ের গৃহেই ফিরতে হয় রিক্ত হস্তে। স্বাভাবিক কারণেই এতে দুঃখে বিমর্ষ হন আমিন সাহেব। কিন্তু দুঃখটুকু শেষ হয় না এখানেই। আনমনা হয়ে মেসিন চালাতে গিয়ে তার পাটাও চলে যায় পরের দিনই। এর পরের ঘটানা গতানুগতিক। পাঁচ হাজার টাকার গ্রাচুইটি নিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে পথে নামেন আমনি সাহেব। আকাশ পাতাল ভেবে কুলকিনারা না পেয়ে তারা আমার খোঁজে বেরিয়েছেন পাঁচ জনের উপদেশে। নট ও নাট্যকার হিসেবে কিছু নাম আছে আমার। আছে পেশাদার পার্টির সাথে কিছু যোগাযোগ। নাদিরাকে কোথাও কোন অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে দিতে পারবো আমি, এই তাঁদের আশা। তা লাগাতে পারলে একটা হিল্লে হয় নাদিরার। অন্যথায় আর কোন পথই নেই নাদিরার সামনে। সুন্দরী হলেও ধর্ষিতা মেয়ে নিয়ে (অন্ততঃ লোকে যখন তাই

বইঘর.কম ও রোকন

জানে) দুদিন স্ফুর্তি করা ছাড়া, চিরদিনের নীড় রচনার স্বপন কম লোকেই দেখে। নাট্যশিল্পী হওয়ার একটা সুযোগ পেলে দু'টো ভাতও পান তারা জানটাও বাচাতে পারেন কোন মতে। আমিন সাহেবের পরিকল্পনা পরিস্কার। সীজন টাইমে বোনের সাথে ঘুরে বেড়াবেন পার্টিতে, অফটাইম শহরের এক কোণে ঠাঁই নিয়ে ছেলে পড়াবেন লাঠিতে ভর দিয়ে। আরো একটা আশা রাখেন আমিন সাহেব। অভিনয়ে অচিরেই নাম করবে নাদিরা। অর্থের সাথে খ্যাতি পাবে প্রচুর–বৃদ্ধি পাবে মান ও সম্মান।

নৌকায় বসে বসে এতক্ষণ তাঁর কথাই শুনছিলাম এক মনে। এবার প্রতিবাদ করতেই হলো তার শেষ আশার বিরুদ্ধে। একটু নড়ে চড়ে বসে ধীর কণ্ঠে বললাম, দেখুন, নিতান্তই নিরুপায় হয়ে এ পথে এলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু খ্যাতি আর মান সম্মানের আশায় যদি আসেন, তাহলে আমি আপনাদের জন্যে কিছুই করতে পারবো না।

শুনে চমকে উঠলেন উভয়েই। আমিন সাহেব বললেন, মানে ? বললাম, মানে ছাত্রাবস্থায় থেকে অদ্যতক এই নাট্যাঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। তাতে আমার যা প্রতীতি, তাহলো, এপথে মান সম্মানের আশা করা একেবারেই বাতুলতা। এছাড়া অর্থকড়ির আশাতেও এ পথে না আসার জন্যে আমি আপনাদের অনুরোধই করবো।

এবার কথা বললো নাদিরা। এ যাবত সরাসরি তেমন কোন কথাই বলেনি সে। একটা ছোট্ট নিঃশাস ফেলে ধীরে ধীরে বললো, আপনার নাম ডাক শুনে ভেবেছিলাম, আপনার কাছে অনেক খানি উৎসাহই পাবো। কিন্তু এখন দেখছি, আল্লাহ যার সহায় নন, তার সহায় হতে বস মানুষই নারাজ।

বিপুল হতাশা ঝরে পড়লো মেয়েটির কণ্ঠে। অপ্রতিভ হয়ে বললাম, মানে ?

সে বললো, আমাদের দূরাবস্থার কথা তো শুনলেনই। এর পরও যদি নারাজ হন আপনি, তাহলে কিই বা আর বলার থাকে আমাদের। বললাম, না না, ঠিক নারাজের কথাতো নয়। কথা হলো খুব একটা বাঞ্ছিত পথ নয় এটা।

- কথাটা কি ঠিক ?

– মানে ?

– আপনি নিজেও তো বেছে নিয়েছেন এপথ ? বিপুল খ্যাতিও অর্জন করেছেন, প্রচুর পয়সাও পাচ্ছেন।

– তোমার এ ধারণা ঠিক নয়। পয়সা যা পাচ্ছি, তা নিতান্তই নগণ্য। আর

বইঘর.কম ও রোকন

খ্যাতি ? কি খ্যাতি যে অর্জন করছি–

– কি খ্যাতি মানে ? কত নাম যশ আপনার। লোকের মুখে কত প্রশংসা শুনি।

– শুনো নাকি ? যদি একান্তই শুনে থাকো, তাহলে বলবো, হাতি দেখার মতো তুমি শুধু সমাজের লেজটাই দেখেছো, গোটা সমাজটা দেখনি।

– তা যাই দেখে থাকি, যে কাজে আপনার নিজের এত আগ্রহ, সে কাজে অন্যকে আসতে দিতে চান না কেন ?

– এক কথায় সেটা বোঝানো শক্ত।

– নাকি অন্য কেউ নাম করুক এ লাইনে, সেটা আপনি চান না ?

চমকে উঠে বোনকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিলেন আমিন সাহেব। করজোড়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন বার বার। নিজের ত্রুটি বুঝতে পারায়, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মেয়েটি।

www.boighar.com

এরপর এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় যে দু'টি প্রশ্ন মুখ্য হয়ে দাঁড়াল তা হলো, আমি তো আর তাদের মতো বেকায়দায় পড়িনি, এত লেখাপড়া শিখেও আমার এ পথে আসার কারণ কি ? দ্বিতীয়তঃ এত খ্যাতির পরেও (অবশ্য তাদের ধারণায়) সংস্কৃতির প্রতি আমার এই বিরূপ মনোভাবের হেতু কি ?

বুঝলাম, বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া আর রক্ষে নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে বিধৃত করতে হলো আমার বিগত বছরগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতা। নৌকা চললো ভাটিতে। আমি এক কাঠি সিগারেট ধরিয়ে সভূমিকা বলে গেলাম সুদীর্ঘ কাহিনীঃ

সোসালিষ্ট, ক্যাপিট্যালিষ্ট– যে গ্রুপেরই হোকনা কেন জাতি, স্পেশালিষ্ট ছাড়া তার আয় উন্নতি সম্ভব নয়। নিতান্তই জানা কথা আর এ কারণেই বৃদ্ধি করার ব্যাপারে মাথা ব্যাথার অন্ত নেই প্রতিটি নেশানের। নেশাগ্রস্তের মতো তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে স্পেসালিষ্ট বাড়ানোর। কিন্তু এত তৎপরতা সত্বেও, সব দেশেই মোট জনসংখ্যার তুলনায় স্পেশালিষ্টদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। কারণ স্পষ্ট। ইচ্ছে করলেই অসংখ্য স্পেসালিষ্ট তৈরী করা যায় না। সে জন্যে প্রয়োজন অনন্য মগজ– যা নগণ্য সংখ্যক লোকেরই থাকে।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বের মানচিত্রে এমন একটি দেশ আছে– যার প্রতিটি বাসিন্দাই এক একটা বিশ্বকর্মা – প্রচন্ড স্পেসালিষ্ট। ব্রহ্মান্ড ভেঙ্গে গড়ার দাবী রাখেন প্রত্যেকেই। তাও আবার একটা কাজে নয়, সে দেশের প্রত্যেকেই একসঙ্গে লক্ষ কাজের স্পেশালিষ্ট। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার যে, সেই স্পেশালিষ্ট হওয়ার

বইঘর.কম ও রোকন

জন্যে সেই দেশবাসীর একরত্তি কষ্ট করতে হয় না। বাবা ভান্ডারীর কৃপায় আন্ডার কনস্ট্রাকশনেই তারা স্পেশালিষ্ট রূপে তৈরী হন– ভূমিষ্ট হন সবজান্তা হয়ে। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বলে না দিলে, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। সে দেশ আমাদের-ই এই স্বর্গাদপী গরিয়সী জন্মভুমি। আমরাই সেই স্পেশালিষ্টদের পাঁচজন। আমরা জানিনে বা পারিনে এমন কাজ নেই। যদি বলেন, মোটা বেতন দেবো, আগামী বিশ্বযুদ্ধে বিশ্ববাহিনীকে হার মানাতে সক্ষম, এমন একজন সেনাপতি চাই, দেখবেন– টি ভির পেসেন্ট থেকে শুরু করে বিকলাঙ্গ, ধ্বজভঙ্গ– আমরা যে যেখানে আছি, সকলেই একসাথে দৌড় দেবো ঐ পদে ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে। স্বর্গের সাথে সিঁড়ি তৈরীর কারিগর চাই ? এই আমরাই আছি। কিংবা যদি বলেন, সম্মিলিত বিশ্বরাজ্য পরিচালনার যোগ্য একজন প্রেসিডেন্ট চাই, তাহলেও দেখবেন আমরা তো আছিই, সেই সাথে আমাদের ঘরের ঐ তেনারও দাঁতে আলাপাতার গুঁড়া ঘষতে ঘষতে সাক্ষাৎকারে হাজির হবেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে। কি বলবেন ? ওসব কাজে সত্যিই কোন যোগ্যতা আছে কি না ? ওসব কথায় কাজ কি ? পদটায় বেতন ক্ষমতা আর উপরি-পাওনা আছে কিনা সেইটে বলুন। আমরা যে বাই বার্থ সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী। একারণেই তো আমরা মিউজিক শিখে হই থানার দারোগা, ফিলোসফি পড়ে হই এঞ্জিন ড্রাইভার, বক্সিং শিখে হই ফাইন আর্টসের এ্যাড্‌ভাইজার। এছাড়া, বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে গানের মাষ্টার হই বাইলেটার‍্যাল স্কুল, বাহাত্তুরে ডিগ্রী নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান হই নেতৃবর্গের সিলেকশানে, মারোয়ারীর ছেলে হয়ে ফিশারীতে চাকরী পাই বিনা প্রতিবাদে। তবু প্রতিবাদে কেউ যদি বলেন, এর জন্যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক কারণই দায়ী, আমি বলবো, কারণ যাই হোক আমাদের অকৃত্রিম আচরণই এই। গরু গাড়ী চালাতে ফেল মারলে, আমরা পার্লামেন্টে গিয়ে দেশ চলানোর খেল দেখাই গুণ্ডার পায়ে তেল মেরে।

এই আদি ও অকৃত্রিম আচরণের ফলে, জীবনের শুরুতেই আমার নিজের অবস্থায় ও হলো গুরুচরণ। পণ্ডিতি করার আশায় প্রথমে সাহিত্য ও পরে আর্ট অব ড্রামার উপর থোরা-বহুত পড়াশনা করলাম দেশে ও বিদেশে। কিন্তু সিলেবাস মাফিক না হওয়ায় সে বিদ্যা দিয়ে কোন বিদ্যালয়ে পবেশ পত্র পেলাম না। কোন মূল্যয়নও হলো না আমার ঐ অর্জিত সনদের। ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত চাকুরী পেলাম পাটের। ঠিক পেলাম বা পেয়ে গেলাম নয়। সিদ কেটে কোন মতে যোগাড় করে নিয়ে এলাম নিতান্তই অন্য কিছু না পেয়ে। পাশ করে বেরিয়ে বাড়ীতে বাস করা, আর বরের অভাবে মেয়েকে ঘরে রাখা, রীতিমতো সামাজিক অপরাধ– প্রেস্টিজ ফাংচারের প্রশ্ন। পড়া শুনা শেষ হলেই চাকরী মেয়ের বয়েস

হলেই বিয়ে এইটাই নিয়ম। ব্যতিক্রমে বিস্তর অস্বস্তি। তাই এই পাটের চাকরী যোগার করে মাঠে মারা যাওয়া থেকে মান সম্মানটা কোন মতে বাঁচালাম কিন্তু চাকরীটাকে বাঁচাতে পারলাম না বেশীদিন। ছন্নছাড়া স্বভাব, অনভিজ্ঞ কাজে মানসিকতার অভাব, প্রতি কথায় কর্তৃপক্ষের শ্রুতিকটু জবাব, সেই সাথে আর্ট অব ড্রামার প্রভাব, সব কিছু মিলে আমার নাজুক মনটাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলো অবিরাম। অবশ্য অন্য কোন ডাটের লোক হলে সেই লুটের বাজারে পাটের চাকুরী করে কয়দিনেই ফাঁপিয়ে তুলতো গাঁটের কলেবর। আরামবাগের আশে পাশে বাড়ী হাঁকিয়ে শেষের দিনগুলি আরামেই কাটাতে পারতো খাটের উপর শুয়ে শুয়ে । কিন্তু ঘাটের মড়ার চেয়েও অপদার্থ আমি। ঘটে আমার বৈষয়িক বুদ্দি নেই একরত্তি। তাই, উড়তি পয়সা ধরাতে অধিক আপত্তি না থাকা সত্বেও, বরাতে চারটে পয়সা জুটলো না বেতনের বাইরে। বুঝলাম, উড়তি পয়সা দেখলেই তা ঘরে তোলা যায় না, তার জন্যে তোলা কয়েক বাড়তি মগজ দরকার। সেটা যার নেই, তার বাধ্য হয়ে খাজা বাবা সাজা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শালীহীন শ্বশুর বাড়ী উপরিহীন চাকরী, শুকনো মরিচ বাটার মতোই সবই নাকি বৈচিত্রহীন। কাজেই প্রেম পয়সা, পরিবেশ কোন কিছুই না পেয়ে, শ্যাম্পেনের পার্টিতে সেভেন আপ পায়ীর মতো মিসফিট হয়ে একদিন পিঠ দেখিয়ে চলে এলাম চাকরী থেকে। স্থির করলাম, আদি পেশা চাষাবাদ চালু করে শেকসপীয়ার আর শিশির ভাদুরীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করবো স্বগৃহে বসে বসে। আর্ট অব ড্রামাটা একেবারে মাঠে মারা যাক এটা ঠিক হবেনা।

যেই কথা সেই কাজ। মনোযোগও অনন্য। কিন্তু ফল হলো অন্য রকম। শেকসপীয়ার আর শিশির ভাদুরী যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। তাদেরর পথে পা বাড়িয়ে আমার মারা গেল মান সম্মান। ভবিষ্যৎ জীবনটা হলো পুরোপুরি ঝরঝরে। চাষবাস চালু হয়ে শেষ হলো শুরুতেই, নিজে হলাম ছন্নছাড়া সংস্কৃতির এক লক্ষ্মী ছাড়া আকর্ষণে।

হাতির বিল গ্রামটা আমার বাফার স্টেটের পরিবেশে অবস্থিত। সামরিক বা রাজনৈতিক দিকে দিয়ে নয়, স্বর্গমর্তের প্রশ্নে। হাতির বিলের উত্তর দিকে গ্রামগুলোর গড়পরতায় শতকরা পঁচিশ জন হিন্দু আর পঁচাত্তর জন মুসলমানের বাস। স্কুল ক্লাব দোকান পাট, হাট বাজার, মঠ মসজিদ আর নাটমন্দিরের সাথে এদিকে আছে সাহিত্য সঙ্গীতে আর চা চক্রের প্রচলন। এ অঞ্চলে শিক্ষিতদের হার অধিক, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ততোধিক, ধর্মমতের অধিকাংশই উদার নৈতিক। এটা দুনিয়াদারীর আড়ত- নরকের দুয়ার।

দক্ষিণ দিকের অধিবাসীরা প্রায় হান্ড্রেড পারসেন্ট মুসলমান। একটু

বইঘর.কম ও রোকন

ব্যাতিক্রমধর্মী ও ভিন্ন মেজাজের মুসলমান। পরমাথ্যে পথে আবর্জনা বোধে উত্তর দিকের সবকিছুই এদিকে বিবর্জিত। এ অঞ্চলের বড় শিক্ষা অর্থছাড়া আমপারা গলাদ্ধকরণ, বড় কালচার – ওয়াজের নামে অন্যের ভাবনায় গালিবর্ষণ। এদের নছিয়ত এক, খাছিয়ত এর এক। এরা আচরণে উগ্র, বিচরণে সংকীর্ণ, ধর্মমতে গোড়া। এটা দীনের ঘাটি বেহেস্ত গেট।

এই দুই ধারার মাঝ খানে বসত বাটি আমার। ঘরের চালের উপর চড়লেই স্বর্গ-নরক অবলোক করা য়ায় অনায়াসে। চাকরী থেকে এসে ঘড়ির দোলকের মতো দুলতে দুলতে একদিন ছিটকে এসেপড়ে গেলাম দুনিয়াদারীর আড়তে। ভেসে গেলাম জাহান্নামের স্রোতে। আমার এই জান্নাত চ্যুতির পেছনে শেকসপীয়ারদের আকর্ষণ ছাড়াও উপলক্ষ্য ছিল আর একটা।

জোড়া কয়েক বলদ আর জন কয়েক মজুর নিয়ে বেশ খানিকটা জমিয়ে তুলেছি কিষাণী, রাত্রিকালে দরজা জানালা বন্ধ করে মুখবন্ধ পর্যন্ত লিখে ফেলেছি– শেকসপীয়ারের মঞ্চ' শীর্ষক প্রবন্ধঃ এমন সময় এলো এক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রি আসছেন ইষ্টিশনে। স্থানীয় এক নাট্যানুষ্ঠান প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন তিনি– ভাষণ দেবেন সংস্কৃতির মূল্যবোধের উপর। শুনেই যাওয়ার ইচ্ছে হলো। ইয়ারদের অনুরোধে সেটা আরও বেড়ে গেল শত গুণে। বেরিয়ে পড়লাম তৎক্ষনাৎ। নৌকাপথে অনেক দূরের পাল্লা। শুধু মাঝিমাল্লা ও বন্ধু বর্গের সীমাহীন তৎপরতায় অনুষ্ঠানে হাজির হলাম নির্ধারিত সময়েই।

কিন্তু তা হলে কি হয়। প্রত্যেক জাতির, ব্যক্তির ও প্রাণীর একটা নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। বাঘের ঐতিহ্য শিকারকে খেলিয়ে খেলিয়ে ভক্ষণ করা, বীরের ঐতিহ্য হলো - প্রচন্ড মারের মুখেও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, রাজা বাদশার ঐতিহ্য - কপর্দ্দক শূন্য হয়েও অকুণ্ঠচিত্তে ব্যয় করা। বাংলাদেশী ভি আই পি-দের ঐতিহ্য হলো– লেট করে সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া। গেট বেধে আসন পেতে অগণিত দর্শক অফুরন্ত ধৈর্য আর আগ্রহ নিয়ে তার জন্যে হা পিত্তেস করবেন ঘন্টার পর ঘন্টা, তবেই না ভি আই পি । পুলিশ আর্মির ছোট বড় চেনা যায় ব্যাজ দেখে। এদেশীয় ভি আই পি দের ছোট বড় চেনা যায় লেটের বহর দেখে। যিনি যত বড় ভি আই পি তত বেশী লেট করবেন তিনি। ট্রেনে এসে ডাক বাংলায়ে ঘন্টা কয়েক বসে থাকার পরও তারই দেয়া সময়ের আরো দেড় ঘন্টা পরে অনুষ্ঠানে তশরীফ আনলেন মন্ত্রি সাহেব। আমাদের আর যাই থাক, এসব ধৈর্য্যের

সীমা আর সময়ের মূল্য– কোনটাই নেই। তা থাকলে জাতির উন্নতি এত বিড়ম্বিত হতোনা– ভি আই পি রাও বুঝতে পারতেন পাঁইতারা ভাঁজার মজা।

শুরু হলো বক্তৃতা। মন্ত্রি সাহেব সমানে টেবিল চাপড়িয়ে সংস্কৃতির নামে যে খিচুরী পাক করলেন, তার স্বাদে বুঝলাম– সংস্কৃতির জ্ঞান তার পল্টন ময়দানের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ নিয়ে কিছু বলার নেই। যা বলার মতো তা সভাপতির ভাষণে বললেন এক অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। শুধু বললেনই নয়, সংস্কৃতির ব্যাপারে রীতিমতো ভাবিয়ে তুললেন সবাইকে, ভাবতে লাগলাম আমরাও। আয়োজিত নাটকটির অভিনয় দেখেও আকৃষ্ট হলেন সকলেই। স্থির হলো– ফিরে গিয়েই ডাকতে হবে মিটিং, ধরতে হবে নাটক।

পরেরদিনই ছাড়া হলো নোটিশ। মিটিং এ হাজির হলেন নাট্যামোদী সকলেই। মিটিং এর স্থান হলো পার্শবর্তী গায়ে–ডাক্তার সরকারের অঙ্গনে। আপন গৃহাঙ্গন এই সৎসভা আহবানের বস্তুতঃই আমার কোন সৎসাহস ছিলনা। যদিও গৃহে নেই গৃহিনী, পুরুষের পাকেই পুরতে হয় পাকস্থলী। তবু গৃহস্থালী তদারকে যিনি বিদ্যমান আছেন, তার দাপটেই আমি কম্পমান সর্বক্ষণ। মাতাপিতা পরিজন জান্নাতবাসী হয়েছেন আমার বাল্যকালে। একক সংসারের একমাত্র শাহানশাহ হওয়া সত্বেও আমার ঘাড়ের উপর চেপে আছেন আকবর শাহর আপদ এই বৈরাম খা। খান সাহেবের পৈতৃক নাম খোদাবক্স। আমার পিতার আমলের নওকর। এমনিতেই চাকরী ছেড়ে চাষী হওয়া চুন পড়েছে বক্স মিয়ার মুখে, তার উপর আবার জাহান্নামে যাওয়ার এই যোগাড় যন্তর দেখলে যে, খুন চাপবেনা তার মাথায়, সেটি বলা দায়।

মিটিং এর শুরুতেই কিছু কথা হলো যাত্রাপালার ব্যাপারে। এর পর থিয়েটারের কথা উঠলেই কে একজন পেছন থেকে বলে উঠলেন, বকরী মারবেন? রামজী কিরিয়া, হামার নাম কাটিয়ে দিন।

চমকে উঠে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, না, গন্ডেরীরাম বাটপারিয়া নয়, ভাটপাড়ার বলরাম পাল। বললাম – তার অর্থ।

বলরাম বললে, আর একদফা শাড়ি ছিড়লে, ঝাটার বাড়ি একটাও মাটিতে পড়বেনা।

– কি রকম ?

–এখানে হল নেই, স্টেজ নেই, আলো বিদ্যুৎ পর্দা উয়িংস কিছুই নেই। আবার সেই বউএর পাছার শাড়ী দিয়ে সীন, আর বিছানার চাদর দিয়ে স্ক্রীন ? ওরে বাসরে। শালা ভুতোটা সেবার আমার যে সর্বনাশ করেছে

বইঘর.কম ও রোকন

এরপরও জিদ ধরে থিয়েটার করতে গিয়ে যে বিপাকে পড়েছিলাম, সে কথা স্মরণ হলে আজও নুয়ে পড়ি লজ্জায়। বলরামের অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে অজ পাড়াগায়ে বই ধরলাম 'মাটির ঘর'। প্রাথমিক প্রস্তুতিটা খোশহালে চললো। প্রবলেমটা দেখাদিলো স্টেজ বাধতে গিয়ে। সীন উয়িংস কোন কিছুই না পেয়ে খাটো-বড় ছেঁড়া-ফাটা বিভিন্ন বস্ত্রখন্ডের সাহায্যে যে তাজমহল তৈরী করা হলো, তাকে স্টেজ বলার চেয়ে বেদুইনদের টেন্ট বললেই মানায় ভাল। ওর উপর যখন শুরু হলো নাটক তখন দেখা গেল নাটকের না টুকু উবে যাচ্ছে ক্রমেই। হাজার রকম গিট গিরে উৎরিয়ে বেডশিটের ড্রপসীন টা উত্থান পতন করলে যে ঝামেলা সৃষ্টি করলো, তাতে সাক্ষাৎ মার্ডার থেকে একটা সীনও রক্ষে করা গেলানা। তদুপরি সাজ পোষাক আর বাদ্যিবাজনা বিহীন এই মনোস্তাত্তিক নাটক পল্লীর দর্শকদের কিছুমাত্র প্রলুব্ধ করতে পারলো না। ফলে, নাটকটি অধিক দূর না এগুতেই বিপুল বেগে পিছুতে শুরু করলো দর্শকরা। যাচ্ছেতাই বস্তুবোধে তারা হৈ হৈ করে উঠে চলে গেল অন্যত্র, গেল এক ঝুমুর গানের আসরে। পরে ডেকে হেকে আর পাঁচগোন্ডা দর্শকও না পেয়ে গুটিয়ে নিলাম পাত্তাড়ী। বলরামকে সেলাম করে পাড়াগায়ে থিয়েটার করার মুখে বাড়িয়ে দিলাম কয়েক আঁজলা পানি।

এরপর বেশ কিছুদিন চুপ চাপই ছিলাম। হঠাৎ আবার ডাক পড়লো ডাক্তার বাবুর দহলিজে। গিয়ে দেখি ইয়ার বন্ধু নাট্যামোদি সকলেই উপস্থিত। এক ঘেয়ে জীবন যাত্রায় সকলেই অতিষ্ট। সবাই চায় একটু খানি চেঞ্জ। একটুখানি রসঘন করতে চায় নীরস জীবনটাকে। সকলেরই ধারণা– একমাত্র যাত্রা পালার মাধ্যমেই তা সম্ভব। টেম্পো দূর্বার। দ্বিমত পোষণের কোন ফাঁকই তারা দিলো না। সামনেই ছিল এক জাতীয় উৎসব। ওটারই উপলক্ষে “মাটির মা” বই ধরে সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো কাষ্টিং। দুদুমিয়া–লক্ষণমানিক্য, আমি রামনুজ।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন,। রিহেয়ার সেলে আসতে আসতেই রস ধরলো মনে। শুরু হলো দুরমার প্রস্তুতি। মুখস্ত পার্ট সাতবার করে মুখস্ত করে অনুষ্ঠানে হাজির হলাম বিপুল উৎসাহ নিয়ে। সেই উৎসাহকে আরো উসকে দিলেন কর্তৃপক্ষ। তারা ঘোষণা করলেন অভিনয়ের উৎকর্ষের উপর পুরষ্কার। শিহরণে চঞ্চল হলো অন্তর। শুরু হলো উত্তমমানের অভিনয়ের প্রতিযোগিতা।

সারারাত বিপুল হর্ষধ্বনী আর হাততালীর মধ্যে দিয়ে শেষ হলো পালা। শেষ দৃশ্যের পর পরই এক গুরু গম্ভীর পরিবেশে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ডাক পড়লো মঞ্চে।

বইঘর.কম ও রোকন

একে একে পাঁচজন লাইন ধরে এস সগর্ব্বে দাঁড়ালাম হাজার জনের সামনে। এবার করতালীতে কেঁপে উঠলো মঞ্চ। পুরস্কারের পদক বক্ষের উপর এটে দিলেন কর্তৃপক্ষের একজন রজত নির্মিত পদকগুলি হেসাগের উজ্জল আলোকে দপদপ করে জ্বলতে লাগলো পুর্নিমার চন্দ্রবৎ। দর্পিত পদক্ষেপে নেমে এলাম মঞ্চ থেকে। লেকেন বিলকুল পাত্থর। পরের দিন দিবালোকে মেডেলটা মেলে ধরতেই দপ করে নিভে গেল উত্তেজনার আগুন। বিশুদ্ধ করগেট ব্রান্ড রুপা নয়, নিরেট করগেট টিন বার্ণিশ করা মেডেল। অঢেল ধন সম্পদে বঞ্চিত হলেও বোধ করি এতটা মর্মাহত হতাম না। পদার্থের মূল্য দিয়ে পুরস্কারের মূল্য বিচার হয় না। কথা ঠিক। কিন্তু এই নিছক পরিহাসের পরিবর্তে একগুচ্ছ ফুল দিয়েও যদি পুরস্কৃত করতেন তারা, তাহলে পরবর্তীতে ধিক্কার থেকে রক্ষে পেতাম সকলেই। কিছুক্ষন থ মেরে বসে থেকে উপলব্ধি করলাম নাট্য মোদীর কদর। পুরস্কৃত হয়েও দীর্ঘদিন বয়ে বেড়ালাম তিরস্কারের টিন মেডালিস্ট টাইটেল।

আচমকা এক ধাক্কায় ভাই বোন উভয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এসে আমার উপর। নাদিরার মাথা এসে ঠকাশ করে লাগলো আমার মাথায়। চমকে উঠে ছইয়ের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি– এ্যাকসিডেন্ট। আমাদের নৌকা ছুটছে ভাটিতে। গতি বেগ বিপুল। উজানগামী আর একখানা নৌকার সাথে আলিঙ্গন এড়াতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা। আমাদের নৌকা খানা কাত হয়ে উঠে গেছে ডাঙার উপর।

মাথায় হাত বুলিয়ে নাদিরা এবার ঈষৎ হেসে বললো, আমি ঐ কর্তৃপক্ষের একজন কেউ হলে, আপনকে টিনের মেডেল দিতাম না, লোহার মেডেল দিতাম।

বললাম, তারমানে ?

নাদিরা বললে, আপনার মাথাটাই তো লোহার। উঃ এত শক্ত।

শুনে সশব্দে হেসে উঠলেন আমিন সাহেব।

নৌকা আবার ছেড়ে দিতেই আমিন সাহেব নড়ে চড়ে কাছে এসে বসলেন। বললেন, বড় ইনটারেষ্টিং কাহিনী আপনার। বলুন, তারপর ? একটু ম্লান হেসে আবার শুরু করলাম কাহিনীঃ

অভিনয়ের পর প্রতিবারই স্থির করেছি– এবার সরে দাঁড়াবো এ পথ থেকে।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এটা এমনি একটা নেশা যে, একবার চুনকালী মাখলে, আর এ পথ থেকে সরে দাঁড়ানো দায়। কয়দিন না যেতেই আবার শুরু হয় চুনকালী। হলোও তাই। আবার পা বাড়ালাম এ পথে। এবার কিছু গ্রামবাসী এগিয়ে এলেন সামনে। প্রগতির ঝান্ডা তুলে জিদ ধরলেন স্বগ্রামেই অনুষ্ঠান করার জন্যে। শুনেই আতকে উঠলাম। কিন্তু এদের সীমাহীন উৎসাহে শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্তই নিয়ে পলামীর পরে বই ধরলাম তোড় জোরে। জোরদার এগিয়ে চললো প্রস্তুতি। এর পরই শুরু হলো–পোস্তানো।

মীর কাশিমের রোল নিয়ে বেশ খানিকটা মেতে ওঠার এবং হাটে বাজারে ঢোল দিয়ে অনেকখানি গেথে যাওয়ার পর দেখি, পাশে আমার কেউ নেই। বর পক্ষ কনে পক্ষ সব আমি একাই। পিছিয়ে আসার পথ নেই। এগুতে হলো সামনেই, আর এতে করে লাভ হলো আর এক নতুন অভিজ্ঞতাঃ

সংস্কৃতি জাতীয় জীবনে যত মূল্যবান পদার্থই হোক; আর এনিয়ে যিনি যত কথাই বলুন, জাতীর দশজন সংস্কৃতিকে বাঁচানোর কথা বড় একটা ভাবেন না কোনকালেই। নাটককে তো নয়ই। এদেশে যাত্রা থিয়েটার আজো বেঁচে আছে শুধু শিল্পীদের একতরফা আত্মনিবেদন ও আত্মোৎসর্গের জোরে, অশেষ নিগ্রহ সহ্যের ধৈর্যেরগুণে। দশজনকে অভিনয় করে দেখাতে হলে, যেখানে দাঁড়ায়ে অভিনয় করবে সে জায়গাটা তৈরী করে নিতে হবে তাদেরই। খরচ, খাটুনী, দাওয়াত, প্রচার- সবরকম দায় দায়িত্ব ঐ শিল্পীদেরই। জাতির দশজন শুধু যথাসম্ভব বিরোধিতা করবেন, অনুষ্ঠানে পুরোভাগে আসন পাওয়ার আশা পোষণ করবেন, ব্যর্থ হলে ফাংশানটাই পন্ড করে দেবেন এবং অনুষ্ঠানান্তে শিল্পীদের গৃহ থেকে- এমনকি সমাজ থেকেও বহিষ্কৃত করবেন- ব্যস। সংস্কৃতির লালনে তাদের ডিউটি কমপ্লীট।

এহেন পরিবেশে বই ধরে ফেঁশে যাওয়ার অবস্থা। দিন যতই যেতে লাগলো, ঝামেলার বহর বাড়তে লাগলো ততই এবং ঘুরে ফিরে সবই এসে পড়তে লাগরো আমার একার ঘাড়ে।

শুরু হয়েছে বই। মেকআপ নিচ্ছি ব্যস্ত হয়ে । গোঁফ একটা এক পাশে লাগিয়েছি। আর একপাশে না লাগাতেই একজন এসে বললে, শিল্পীর এদিক এসো। এলাম এদিকে। দ্বিতীয় গোফ লাগাতেই দ্বিতীয় জন বললে শিল্পীর ওদিকে যাও। গেলাম ওদিকে। পোশাক পরতেই ডাক পড়লো- এটা আনাও।

আনালাম। পাগরী পরতেই পয়গাম এলো- ওটা সামলাও। সামলালাম। অতঃপর আরো ডজন কয়েক দাবী দাওয়া পূরন করে, চরণে পাদুকা দিতেই আমাকে স্মরণ করলেন চার্ট মাষ্টার । বললেন, স্বয়ং মরণ এসে হাজির হলেও তাকে বরণ করার আর সময় নেই। কারণ আমার মঞ্চে প্রবেশ আসন্ন। ক্যাচিং ওয়ার্ড এসে গেছে সামনে। সেনাপতি সমরু আর একটা কথা বললেই ক্যাচিং ধরে ঢুকতে হবে আমাকে। তেষ্টায় প্রাণটা ওষ্ঠাগত। অবিরাম ঝঞ্ঝাটে-পার্টটাও ভুলে গেছি অনেকখানি। একটু পরই চার্ট মাষ্টার চাপাকণ্ঠে বললেন, মীরকাশিম, ঢুকে পড়ো। ঢোকচিপে ধাপ তুলতেই এক লোক পেছন থেকে ছুটে এসে খপ করে টেনে ধরলো আমাকে। সম্বোধন ভুলে গিয়ে চার্টমাষ্টারের অনুকরণেই সে ব্যস্ত কন্টে বললে, মীরকাশিম। পার করো। শিগ্রীর পার করো। তাকে সবলে সরিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলামনা। মরিয়া হয়ে এসে সে টেনে ধরেছে আমাকে। চেয়ে দেখি, অহিরুদ্দীন। গায়ের মানুষ। অক্ষরহীন, বোকা। এ মুহুর্তের গুরুত্ব তার বোধগম্যের বাইরে। সে এসেছে যে জন্যে-সেইটেই তার কাছে বড়, সর্বাধিক জরুরী। তাই,. আমি যতই বলি, শিগগীর ছাড়ো সে ততই অস্থির হয়ে বলে, আরে দুত্তোর । আগে পার করো। পন্ড, হলো সীন। শুরু হলো গন্ডগোল। মঞ্চের অভিনেতারা নাসিকা কুঞ্চিত করে নেমে এলেন মঞ্চ থেকে। দিশেহারা প্রম্পটার জুড়ে দিলেন কনসার্ট।

www.boighar.com

ঘটনা সামান্য। নদীর এপারে অনুষ্ঠান। খেয়াপারের তরী কে বা কাহারা ডুবিয়ে দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। একক্ষণে ওপারে কিছু শ্রোতা এসে চীৎকার করছে পার হতে না পারায়। কিন্তু অন্যের কাছে ঘটনাটা সামান্য নয়। পার করার ব্যবস্থা না করে অনুষ্ঠান করা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। তাই, এপারের কারো মা বোনের সম্ভ্রম রেখে কথা বলছেন না ওপারের শ্রোতৃমন্ডলী। পরিস্থিতি মারাত্মক। আমরা করবো নাটক, আর তার জন্যে গায়ের ইজ্জত মারবে অন্যলোকে- এটা সহ্য করবে কেন গায়ের আর পাঁচটা কৃতি সন্তান। এনিয়ে ইতিমধ্যেই ঝড় উঠেছে মাতবরের বৈঠকখানায়। বুঝতে পেরে অহিরুদ্দীন ছুটে এসেছে বুদ্ধি করে। ওপারে গালীর মাত্রা আরো অধিক বৃদ্ধি পেলে আমার প্রাণদন্ড সুনিশ্চিত। কাজেই মীরকাশিম যাও. যদি আসন্ন প্রাণ দন্ড থেকে পরিত্রান চাও তো, পার করো।

ক্ষোভে দুঃখে সেই মুহূর্তে মনে হলো,. রঙ্গমঞ্চের মীরকাশিম না হয়ে যদি সত্যি সত্যিই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাশিম হতাম হাতলে সেই দন্ডেই

বইঘর.কম ও রোকন

মাথা কাটাতাম অহিরুদ্দিনের, মাথা কাটতাম ওপারের অশান্ত শ্রোতৃমন্ডলীর, আর মৃত্তিকার তলে জীবনন্ত প্রোথিত করতাম এপারের এই হৃদয়হীন মাতব্বরদের।

চেপে গেল জিদ। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অতঃপর আরো ক'বার অংশ নিলাম অভিনয়ে। অংশ নিলাম বিভিন্ন দলের যাত্রা পালায়। বিভিন্ন গোষ্ঠির থিয়েটারে। অভিনয়ের খাতায় পোক্ত হলো নাম। অভিনয়ের দক্ষতাও স্বীকৃতি পেলো সংশ্লিষ্ঠ মহলে। ইতিমধ্যেই শেষ হলো আমার প্রথম পালা মীরজুমলা রচনা। স্বভাবতই সাধ হলো– মঞ্চায়নের মাধ্যমে রচনাটির মূল্যায়ন করার। শুরু হলো মহড়া। শেষ হলো প্রস্তুতি।

অনেক ছুটাছুটি করে স্বরচিত যাত্রা পালা সেন্সর করালাম পারমিশনের জন্যে। পারমিশানে কর্তৃপক্ষ লিখে দিলেন, 'ইফ দি লোকাল অথরিটি হ্যাজ নো অবজেকশন।' (যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আপত্তি না থাকে) লোকাল অথরিটি ইউনিয়ন পরিষদ। চেয়ারম্যান সাহেব উৎসাহ দিয়ে বললেন, চালান। চললো তৎপরতা। নিজের লেখা বই। তাই মহানন্দে হৈ হৈ করে মঞ্চ বাধলাম, ড্রেসার আনালাম, পেন্টার আনলাম, হাটে বাজারে ঢোল সহরত দিয়ে অগণিত দর্শক আনলাম। নির্দিষ্ট রজনীতে বেজে উঠলো কনসার্ট। সেনাপতির আটশাট পোষাক পরে ডাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তরবারির বাঁট ধরে। কনসার্ট অন্তেই আওরঙ্গজেবের প্রবেশ। রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ পথে আওরঙ্গেজেব পোজ নিয়ে দন্ডায়মান। বন্ধ হলো সনসার্ট। দম বন্ধ হলো সকলের। কিন্তু একি। আওরঙ্গজেবকে পেছনে ঠেলে বেগে মঞ্চে প্রবেশ করলেন চেয়ারম্যন সাহেব। শুরু করলেন সংলাপ। নাটকের নয়, তার ক্ষমতার। বীর বিক্রমে তিনি বারংবার বলতে লাগলেন, আই, বাই চেয়ারম্যান, স্টপ ড্রামা। বাংলায় কমান্ড করলে জমে না, তাই ইংরেজীতে কম্যান্ড করলেন উনি। উত্তেজিত ছিলেন বলেই হয়তো ইংরেজীর বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারলেন না। তবে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা বলে বন্ধ করলেন নাটক। আদেশ বলবত করতে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো চৌকিদার, দফাদার ও আনুসঙ্গিক সাঙোপাঙেরা। ঘটনা কিছুই নয়। তার কোন এক ভাগ্নে না ভাস্তে এসে বসার আসন নিয়ে বসচা করে ফিরে গেছেন গোস্বা হয়ে। সেই রাগে ভস্মিভূত হয়ে উনি ভেস্তে দিলেন অনুষ্ঠান।

বজ্রাহতের মতো অসাড় হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। পরে পোষাকাদি খুলতে

লাগলাম বিধ্বস্ত অন্তরে। সেদিনের সেই মর্মব্যাথা বর্ণনার অতীত। সেই খেয়াল খুশীর একটি কথা ' আই বাই চেয়ারম্যান' – মনে হলো শক্তি শেলের চেয়েও শক্তিশালী, বজ্রপাতের চেয়েও মর্মান্তিক। পারমিশানের ঐ একটু খানি মারপ্যাচে ভেস্তে গেল সংস্কৃতির সকল সাধনা, বিফল হলো বিনিদ্র রজনীর যাত্রাপালা রচনা, ব্যর্থ হলো বিপুল উৎসাহ আর অর্থব্যয়., পন্ড হলো দীর্ঘদিনের অমানুষিক পরিশ্রম।

* * * * * * *

ইশ। বড় মর্মান্তিক। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মন্তব্য করলো নাদিরা।

চাপা নিঃশ্বাস ফেলে আমিন সাহেব বললেন, কিছু কিছু লোক সত্যিই বড় বিবেকহীন। এদের খেয়াল খুশির আচরণে সত্যিই বিষিয়ে উঠে জীবন।

বললাম, শুধু কিছু কিছু লোক নয়, আমাদের সমাজটাই এ ব্যাপারে অনুদার। হৃদয়হীন, বিবেকহীন।

সন্দেহাকুলচিত্ত নাদিরা আবার প্রশ্ন করলো, তারমানে, সমাজ আপনাকে আটক টাটকও করেছিল নাকি ?

বললাম, শুধু আটকই নয়, একেবারেই বয়কোট করে কোনঠাশা করেছিল পুরোপুরি। সহ্য করতে হয়েছিল সীমাহীন উপেক্ষা ও অসামান্য বিপর্যয়।

আমিন সাহেব বললেন, মানে।

বললাম সে অনেক কথা । ওসব এখন থাক।

চেয়ে দেখি, আমার গ্রাম হাতিরবিল একবারেই সন্নিকটে। যদিও এদের আরো যেতে হবে অনেক দূরে, আমাকে নামতে হবে এখানেই। কাজেই কাহিনীকে এককোপে খাটো করে বললাম, আরও অনেক ঘাত প্রতিঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে গায়ের বসবাস তুলে দিয়ে চলে এলাম শহরের বাড়ীতে। সেই থেকে শহরেই আছি।

কিছুক্ষণ দম ধরে থাকার পর আমিন সাহেব বললেন, আমি ভেবে পাচ্ছিনে, শেষ পর্যন্ত এ লাইনে আপনি টিকে রইলেন কি করে ?

স্মিত হাস্যে বললাম, ঐ একটি জিদের জোরে। – লেট দি ডগস বার্ক এ্যান্ড ক্যারাভান গো সাইলেন্টলী।

অতঃপর সকলেই নীবর। ওদের মুখমন্ডল লক্ষ্য করে বুঝলাম, আমার যুক্তির যথার্থতা এতক্ষণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন দু'জনই। আর সে কারণেই

বইঘর.কম ও রোকন

হতাশার অতল তলে তলিয়ে গেছেন ওরা- হাতড়োচ্ছেন অবিরাম, পাচ্ছেন না কিছুই।

মায়া হলো। তাই আমি এবার নিজেই সাহস দিলাম ওদের। এপথে আসার জন্যে নাদিরাকে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করলাম। নৌকা থেকে নামার কালে স্থির হলো, এ পথই বেছে নেবে নাদিরা এবং সে জন্যে তারা অচিরেই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন আমার শহরের বাড়ীতে। যত বাধাই থাক, নাদিরারও নীতি হবে,-লেট দি ডগস বার্ক এ্যান্ড ক্যারাভ্যান গো সাইলেন্টলী'।

# তিন

বেশ কয়েকদিন গাঁয়ে কাটিয়ে শহরের বাড়ীতে ফিরে এলাম এক সন্ধ্যায়। দীর্ঘদিন বাইরে থাকায় দীলদরিয়া না কোশ ছিল খোদাবক্সের। নারাজ ছিল তার মেজাজ মর্জি। আমার বহাল তবিয়ত প্রত্যাবর্তন তার কাছে খুশির খবর হলেও মনে তার বিক্ষোভ ছিল প্রচুর। তাই তার জের চললো দীর্ঘ দিন। এই যক্ষের পুরি সে আর একা একা পাহারা দিতে পারবেনা, এত লোকের মরণ হয় তার কেন হয় না, এত লোক মানুষ হলো আমি কেন তা হলেম না ইত্যাদি অনুযোগের বাণী নিয়ে গজ গজ করতে করতে খোদাবক্স শেষ করলো চা পর্ব। অতঃপর চাওয়ার পূর্বেই সাপ্তাহিক -ডেলি। উদ্দেশ্য - আমার অনুপস্থিতির বহরটা স্মরণ করিয়ে দেয়া। দীর্ঘদিন গৃহছাড়া। কাজেই সব কিছুই পরিমানে যে খানিকটা মাত্রা ছাড়া হবে, এ আর বিচিত্র কি। বিদায় হলো খোদাবক্স। আমি সিগারেটে আগুন দিয়ে মন দিলাম চিঠিতে।

সবগুলোই চিঠি নয়। অধিকগুলোই দাওয়াত পত্র, কার্ড, ফেরতা রশিদ, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, বিজ্ঞাপন ও প্যামপ্লেট। এগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বেছে নিলাম আসল চিঠিগুলো। তারও সংখ্যা কম নয়। কয়েকটা পাঠিয়েছেন যাত্রা দলের অধিকারী, ডাইরেক্টার ও শিল্পীরা। কেউ চেয়েছেন পান্ডুলিপি, কেউ চেয়েছেন সিকোয়েন্সের ব্যাখ্যা, কেউ করেছেন প্রথম রজনীর মঞ্চায়নে আমন্ত্রন। বলা বাহুল্য সম্ভাব্য খরচাদির নিশ্চয়তাও দান করেছেন সে কারণে।

পর পর দুই খানা চিঠি পেলাম বন্ধুবর রহমানের। শহিদুর রহমান। যাত্রা জগতে আলোড়ন আনা দল বন্ধুবরের অপূর্ব অপেরা। প্রভুত অর্থের মালিক আমার এই রাজধানীতে বসবাসকারী বন্ধুটি। বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের

বইঘর.কম ও রোকন

স্বত্বাধিকারী তিনি। অর্থের পরিবর্তে নেহাতই সখের খাতিরে এই সেমি সৌখিন দল গড়েছেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। অল্প পেশাদার ও অধিক এ্যামেচার শিল্পীদের সমন্বয়ে সৃষ্ট এই ড্রামাটিক ক্লাবে অভিনয় করেন অনেক গুণিজ্ঞানী ও পদস্থ ব্যক্তিবর্গ। সবকিছুই ব্যতিক্রম ধর্মী। থিয়েটারের পরিবর্তে যাত্রাপালার মোহড়া চলে তার অতিরিক্ত আড়ত ঘরে। মাইনে করা ম্যানেজার অধিকারীর ডিউটি করেন আড়ত বাড়ীর গেষ্ট রুমে। ঐ গেষ্টরুমটাই হেড অফিস– সদস্যদের এ্যাসেম্লিহল। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ও জায়গার আমন্ত্রণ ছাড়া যত্রতত্র বই নিয়ে বেরোয়না এই অপেরা। কর্মব্যস্ততার একঘেয়েমি ছিন্ন করে মাঝে মধ্যে দল নিয়ে বাইরে গিয়ে আউটিংস এর স্বাদ গ্রহণ করেন এর সদস্যেরা। অপেরাটি অপূর্বই বটে। মঞ্চায়নের সল্পতাহেতু অর্থঘাটতি প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ রহমান সাহেব এ ব্যাপারে গৌরীসেন পেশাদার গোটাকয়েক শিল্পী, একটা ম্যানেজার আর গুটিকয় হেলপার, এ আর এমন কিছু অধিক নয়। ড্রেসার পেন্টা ব্যান্ডপার্টি– সদস্য শিল্পী সকলেই। অল্প পয়সায় ফুলটাইম সার্ভিস দেয় প্রয়োজনের সময়। এ ছাড়াও আবার বন্ধু সদস্যেরাও জগৎশেঠ অনেকেই। অতএব, ডু ফূর্তি।

অবশ্য ইচ্ছে করলে এই দল দিয়ে বেশ কিছু পয়সা কামাই করতে পারতেন উদ্যোগীরা। কিন্তু সেটা কারো উদ্দেশ্য নয়। দলের গদা শহিদুর রহমানের পরিকল্পনাও ভিন্ন। সীমিত যে ক'টি অনুষ্ঠান করতে চান তিনি, তা অদ্বিতীয় হোক, অবিস্মরণীয় হোক– এই তার লক্ষ্য, তার গো। ফলে এক একটি পালা মোহড়া চলে মাসের পর মাস ধরে, ক্ষেত্র বিশেষে বছর ধরে। অভিনয়ে দক্ষতা নেই রহমান সাহেবের। সে দাবীও তিনি করেন না। কিন্তু সখ ও প্রয়োজনে নিজেকে, আমাকে এবং সেই সাথে আরো অনেককে অভিনয়ে নামাতে কসুর করেন না তিনি। তাঁর যুক্তি– আর্য অপেরায় জমিদাররা বেরোতেন অভিনয়ে। এমন কি দোষের কাজ। মানসিক সংকীর্ণতা স্ত্রী মনের পক্ষে একটা ফেমিফাইন ভার্চু।

সেই বন্ধুর দু দুখানা চিঠি। এক এক করে খুলে দেখি একই খবর। মাস দুই ধরে মহোড়া চলছে আমার লেখা পালার। লোক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লেখা এক উপাখ্যান ধর্মী নাটক। দেশের বাইরে থাকতে এক সেমিনারের প্রয়োজনে লেখা–'দি প্রিন্স' রচনার নাট্যরূপ 'রাজপুত্র'। নাটকটি জটিল। বিশেষ করে নায়কের ভূমিকাটা। সিকোয়েন্সে বুঝে উঠতে না পারায় রোলটা রপ্ত করতে পারছেন না নাম করা নায়ক। প্রাচীন পটভূমির উপর সাইগল জগন্ময়মিত্র জাতীয়

বইঘর.কম ও রোকন

আবেগময় সুরের গান ও মাঝে মাধ্যে ব্লাংক ভার্সের সমন্বয়ে রচিত এই পালাটি ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন ডাইক্টোর নিজেও। তাই ডাক পড়েছে আমার। বন্ধু জানিয়েছেন, আহবান ব্যর্থ হলে আমাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়ারও এরাদা আছে তাঁর। বুঝলাম, অচিরেই জবাব না পাঠালে দুর্ভোগ আছে কপালে। জরুরী বোধে চিঠি দুটো সরিয়ে রাখলাম একপাশে।

এরপর হাতে এলো একটা মোটা ধরণের খাম। কোথা থেকে আসতে পারে এটা–খামটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই এক কোনে একটা লেখার উপর আটকে গেল চোখ। এক অনির্ব্বচনীয় শিহরণে শিহরিত হলো সর্বাঙ্গ। খামের এক কোনে ছোট্ট করে লেখা–হেনা, বাঘাবন।

অভিভুত হয়ে লেখাটার দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। হেনার কোন চিঠি পাবো–এমন কল্পনাও আমি কোন দিন করিনি। জাজ্জিল্যমান খামটা হাতের মধ্যে নিয়েও সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছিল অন্তর। বাঘাবন কথাটা খামের সাথে না থাকলে, মাথায় মুগুর মেরেও এ বিশ্বাস আমাকে করাতে পারতো না কেউ। ভাবতে লাগলাম, কি কথা লিখতে পারে হেনা। এত মোটা চিঠি, কি এত লেখার আছে তাঁর।

কম্পিত হস্তে খুলে ফেললাম খামখানা। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আমারই কয়েক কপি ছবি। সাথে ছোট্ট একটা চিরকুট উল্টে পাল্টে এর অধিক আর কোন কিছুই না পেয়ে হতাশ হলাম অনেকখানি। অবশেষে মেলে ধরলাম চিরকুট। মাত্র কয়েক ছত্র লেখা। কিন্তু লেখাগুলো মুক্তার মতো। চকচকে–ঝকঝকে। কোন সম্বোধন না করেই সে লিখেছেঃ

ট্রেন থেকে নামার সময় সীটের নীচে পেলাম এক স্টুডিওর এক খাম। খুলে দেখি আপনারই কয়েক খানা ছবি। তাও আবার সত্যায়িত করা। ঠিকানা ছিল খামের গায়েই। তাই পাঠিয়ে দিলাম ছবি কটা। দেখতে বড় সুন্দর আপনার ছবি। যেমনি আপনি তেমনি আপনার ছবিগুলো। চোখ দিলে ফেরানো যায় না চোখ। ইতি হেনা।

খেয়াল হোলো। ছবিগুলো ব্যাগের মধ্যেই ছিল। হয়তো চাদরখানা বের করার সময় ছবির খামটা পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। আর সেটা পায়ে পায়ে চলে গিয়েছিল ওদের সীটের নীচে। ঐ হুটাপিটি আর আলো আধারের মধ্যে ওটা চোখে পড়েনি কারো। দেখি ছয় কপি ছবির ছয় কপিই আছে। নেগেটিভ টা নেই। হয়তো ওটা পায়নি হেনা। ওটা হয়তো বেরিয় গেছে খাম থেকে রয়ে গেছে ট্রেনেই। পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল অন্তর। ছবিগুলোর জন্য নয়। ওটার গরজ আর তেমন ছিলই না।

অন্তর তৃপ্ত হলো চিরকুটির শেষ কথায়। আমাকে যে ভাল লেগেছে হেনার, তা তার ট্রেনের হাবভাবেই বুঝেছিলাম। সেই সাথে এও বুঝেছিলাম যে ক্ষণিকের এই ভাল লাগা দু'দিনেই ঝিমিয়ে পড়বে অলক্ষ্যে। ভিন্ন কোন আকর্ষণের আবর্তে আপসে আপ তলিয়ে যাবে বিস্মৃতির অতল তলে। না রইবে অস্তিত্ব, না ছড়াবে গন্ধ। নগদ যা পেয়েছি ঐটুকই সার-ঐটুকুই ঢের। তার সেই অন্তরস্পর্শী আচরণ আর হৃদয়স্পর্শী -বাক্যালাপই এই বউন্ডেলে জীবনের একটা মস্তবড় পাওয়া। ভবিষ্যতে আরও কিছু আশা করা যুক্তিহীন। সে জন্যে বাঁকীর খাতা খুলে রাখাও নিবুর্দ্ধিতা। আজ সেই ভবিষ্যতের আশাটাই বড় হয়ে দেখা দিল আবার। নগদকে গৌন করে, মুখ্য হয়ে দেখা দিল অনাগত ভবিষ্যতের এক অনিশ্চিত পাওনা।

কয়েকদিন পরের কথা। আসরের নামাজ অন্তে লেখার টেবিলে বসে মাথায় পেরেক ঠুকছি অবিরাম। খুজে ফিরছি আর একখানা উপন্যাসের প্লট। টক বোধে নাটক লেখা খাটো করেছি আগেই। এবার উপন্যাসিক হওয়ার আশায় ক্ষেপে উঠেছি চরম। তাই, পরম আগ্রহে আসমান জমিন ভ্রমন করছি উপন্যাসের মাল মশলার সন্ধানে। অনেক খানি গুছিয়ে নিয়েছি বিষয় বস্তু। এমন সময় বিকট শব্দ। বজ্রপাতও বলা যায়। কণ্ঠ আমার খোদাবক্সের। খোদাতায়ালার এক অকুণ্ঠ দান। নমরুদ বিনিন্দিত দম্ভে বক্স সাহেব শাসন করছেন কোন এক কমবকতকে। প্রথমদিকে তেমন একটা কান দিলাম না ওদিকে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে একটু ঘুরে বসলাম উল্টো মুখে। ভেজিয়ে দিলাম দুয়ার। কিন্তু সবই পন্ডশ্রম। নুহের (আ) প্লাবনকে বাধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখি কতক্ষণ। কান দিতেই হলো ওদিকে। আর কান দিতেই কানে পড়লো বক্স মিয়ার খান কয়েক শান দেয়া বাণীঃ " বেরোও, বেরোও বলছি এখানে থেকে। এটা কি খয়রাত খানা, না তোমার চৌদ্দপুরুষের জমানো ভান্ডার ? ওসব ভন্ডামী রাখো। ভিক্ষে চাই- সে কথাটা স্পষ্ট করে বলতে বুঝি মান যায় ? এ্যাহ। দেখা করতে চাই। তার মানেটা যে কি, তা বুঝি আর বুঝিনে। যত্তসব খোড়া ন্যাংড়ার ভেটকি। ভালোয় ভালোয় বেরোবে তো বেরোও, নইলে এক ঠ্যাং তো গেছেই, আর একখানাও গুড়িয়ে দেবো ঠেংগিয়ে- হ্যাঁ।"

www.boighar.com

এক তরফা বলে যাচ্ছে খোদাবক্স। কোন হতভাগ্য যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হজম করছে এগুলো, তা কান দিয়েই আঁচ করতে পারলাম না। তার শেষ কথা কানে পড়তেই আতকে উঠে ছুটে এলাম বাইবে। এস দেখি যা ভেবেছি তাই। ক্রাচের সাহায্যে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন রুহুল আমিন সাহেব। তড়িৎ বেগে এদিক ওদিক চাইতেই দেখি. নাদিরা আমিন গেটের বাইরে। জড়ো সরো হয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

দাঁড়িয়ে আছে গেটের থামের আড়ালে। লক্ষ্য করে দেখি, উভয়েরই নুয়ে পড়েছে মাথা– নজর তাদের মাটির দিকে নিবদ্ধ। মৃত্যু ছাড়া এই মুহুর্তে আর তাদের কাম্য কিছু ছিল, এমন কল্পনা করা বাতুলেরও অসম্ভব।

এই মর্মান্তিক দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভে, দুঃখে লজ্জায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো আমার। ইচ্ছে হলো, বৃদ্ধ খোদাবক্সকে দুই হাতে তুলে আছাড় মারি শানের উপর। ছেলে মানুষ হলে হয়তো করেই ফেলতাম তা। বৃদ্ধ বলেই পারলাম না। কড়া এক ধমকে খোদাবক্সকে থামিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম আমিন সাহেবকে। ক্ষমা চাইলাম বারবার। পুনঃপুনঃ বললাম, এটি স্রেফ একটি দুর্ঘটনা– অজ্ঞ খোদাবক্সের বেয়াকুবী। অপঃপর ছুটে গেলাম নাদিরার কাছে। ঐ একই ভাবে বুঝিয়ে দুই ভাইবোনকে নিয়ে এলাম বারান্দায়।

হতবুদ্ধ খোদাবক্স কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একপাশে। এরা যে আমার এতটা আপন তা ভাবতেই পারেনি সে। আগে পিছে না ভেবেই মাত্রাধিক খবরদারী করে যে কতবড় বেয়াকুবীটা করে ফেলছে সে, বোধকরি, সেইটেই সে মাপ করছিল মনেমনে। তদুপরি, আড়ালে দাঁড়ানো নাদিরা তার চোখে পড়েনি নিশচয়ই। নইলে মাথায় তার যতছিটই থাক, পরিপাটি পোষাকের এমন একটি মেয়ে সাথে দেখে সে আমিন সাহেবকে ফকির মিসকিন ঠাওরাতো না কিছুতেই।

কারণটা যাইহোক অপরাধটা অমার্জনীয়। তাই খোদাবক্সকে সবলে টেনে আনলাম ওদের সামনে। সগর্জনে কিছুক্ষণ তিরস্কারের পর ওদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দিলাম তাকে। এতবড় রূঢ় আচরণ আমি তার সাথে এ জীবনে করিনি। কিন্তু পরিস্থিতি নিতান্তই লাচার। কোন বিত্তমান আত্মীয় বা বন্ধুর ব্যাপারে হলে এতটার প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু যারা ভাগ্যদোষে অসহায় অথচ আত্মমর্যাদায় সচেতন, তাদের মর্মে এ লাঞ্চনার যে কতখানি বিধে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহু দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে দিয়ে যারা আশ্রয়ের আশায় আমার কাছে এসেছেন,তাদের মনকে প্রবোধ দিই কি দিয়ে।

খোদাবক্স সত্যি সত্যিই ওদের পায়ের দিকে ঝুকে পড়তেই রে-রে করে আতকে উঠলে ভাই বোন উভয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমিন সাহেব খোদাবক্সকে এক হাতে তুলে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন আবেগে। বাপ বয়েসি মানুষ পায়ে হাত দিলে যে গুনাহ হবে অপরিসীম, সেই ভয়েই আমিন সাহেব কাঁপতে লাগলেন মনে মনে। অভিযোগ তার উবে গেল পলকে। উপরন্তু নিজেকেই অপরাধী মনে করে তিনি শশব্যস্তে ক্ষমা চাইতে লাগলেন খোদাবক্সের কাছে। বৃদ্ধ খোদাবক্স ছল ছল নেত্রে সস্নেহে হাত

বইঘর.কম ও রোকন

বুলাতে লাগলো উভয়ের মাথায়। হৃদয়ের ঔদার্যে আর অন্তরের অনাবিল পরশে অভাবিত ভাবে হলো এই নিদারূণ পরিস্থিতির এক সুবিমল সমাধান।

নৈশভোজনের টেবিলে বসে বুঝলাম, পাস্ট ইজ পাস্ট। বর্তমানটা একেবারেই ভিন্নতর। খোদাবক্স এবং নাদিরা এখন একেবারেরই ভিন্ন মানুষ। বিস্তর ভাব জমেছে তাদের মধ্যে। শুরু হয়েছে মত বিনিময়। রান্নাঘরের তদারকী খোদাবক্স ছেড়ে দিয়েছে নাদিরাকে। নাদিরাও তার একান্ত সচীব হিসাবে গ্রহণ করেছে খোদাবক্সকে। লক্ষ্য করলাম, এক নতুন আশার আলোকে খোদাবক্সের মুখমন্ডল উদ্ভাসিত। কোন মেয়ে ছেলের প্রতি কোন আগ্রহই সে লক্ষ্য করেনি আমার। না ঘরে, না বাইরে। এ নিয়ে আক্ষেপেরও সীমা ছিল না খোদাবক্সের। জোয়ান তাজা ব্যাটা ছেলের নারীর প্রতি আকর্ষণ না থাকলে বিয়ের প্রশ্ন আসে কোত্থেকে। ঘরে একটা বউ আসুক, খোদাবক্সের দীর্ঘদিনের সাধ। কিন্তু সে সাধটা যে তার পূরণ হবার নয়, এ বিষয়েও খোদবক্স নিশ্চিত ছিল পুরোপুরি। আজ যেন হঠাৎ সে একটা আভাস পেয়েছে তার। এদের প্রতি আমার এই ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ খোদাবক্সের আভাসটি পোক্ত হচ্ছে ক্রমেই। গৃহবধু হিসেবে নাদিরারকে যে কারুর পছন্দ। যে কোন ঘরই আলোকিত করে রাখার মত পর্যাপ্ত রূপ আছে নাদিরার। একটা বধু এলেই বর্তে খায় খোদাবক্স। নাদিরা তার কাছে অতিরিক্ত পাওনা। লক্ষ্য করলাম, আনন্দ আর উৎসাহ খোদাবক্সের কামোৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ, নড়ন চড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে চতুর্গুণ, আহার্য্যের পদগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রকারে ও পরিমানে অনেকগুণে বেশী। হয় তো মুনিবের গচ্ছিত ধন বলেই আমার সেবায় গাফিলতি নেই খোদাবক্সের । কিন্ত তার অতিথি সেবার আধিক্য এই প্রথম।

পরেরদিন আহারান্তে আমিন সাহেব আসল কথা পাড়লেন। বললেন, 'বসত বাড়ীটা বিক্রি করে কিছু পয়সা কড়ি যোগাড় করে এনেছি। গ্রামের সাথে সম্পর্ক চিরজীবনের মতো শেষ।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমিন সাহেব পুনরায় বললেন, ' আর কি হবেই বা সম্পর্ক রেখে। আহা বলার মতো তো আর একজনও নেই সেখানে। স্বদেশ বিদেশ এ এখন আমাদের সমান। এখন এখানে একটা মাথা গোজার ব্যবস্থা যদি করে দিতে পারেন, তাহলে বিশেষ উপকার হয়।'

ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, মানে?

আমিন সাহেব বললেন, ' মানে, একটা ছোট খাটো বাসা। ভাড়াটা যত কম হয় ততই ভাল। দু'জন মাত্র লোক। দু'চারটে টিউশনী যোগার হয়ে গেলে আমি তো দিনরাত পড়ে থাকবো বাইরে। থাকবে শুধু নাদিরা একা। তাই ছোট্ট একটা

বইঘর.কম ও রোকন

বাসা হলেই চলবে। তবে বাসাটা আপনার বাসার আশে পাশে হলে বড় ভাল হয়।'

আমিন সাহেব তার সংকল্পের কথা প্রথম দিনেই বলেছিলেন। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবেন, নাদিরাকে অভিনয়ের কাজে লাগিয়ে দিয়ে তিনি টিউশনী করে বেড়াবেন। এ পর্য়ন্ত জানতাম। শহরে এসে এককোণে ঠাঁই নেবেন একথাও বলেছিলেন আমিন সাহেব। কিন্তু সেই কোনটা কোন খানে হবে বা হতে পারে, সে কথা সেদিন ভাবিনি, এরা আসার পরও তার উপর গুরুত্ব দেইনি। আমিন সাহেবের কথায় তাই একটু বিস্ময়ের সাথে বললাম, আমার বাসার আশেপাশে বাসা।

আমিন সাহেব বললেন, হাঁ নাদিরাকে প্রায় একা একাই থাকতে হবে কিনা। সোমত্ত মেয়েছেলে। কখন কোন বিপদ হয়–

খোদাবক্সের ভাষায় আমার এই যক্ষেরপুরী জনহীন থাকায় তাদের মাথা গোঁজার ব্যাপারটা কোন সমস্যাই ছিলনা আমার কাছে। তাই, আগেপিছে না ভেবে ফস করে বলে ফেললাম, আমার এখানে থাকতে কি অসুবিধা হবে আপনাদের ?

বুঝতে না পারায় আমিন সাহেব প্রশ্ন করলেন, এখানে। এখানে কোথায় ?

বললাম, কেন, আমার বাড়ীতে। এতবড় বাড়ী, থাকি আমরা মোটে দু'জন।

আপত্তি তুললো নাদিরা। বললো, আপনার বাড়ীতে। তা কি করে হয়।

হুঁশ হলো। আর হুঁশ হতেই লজ্জা পেলাম অনেকখানি। সংশোধনের উদ্দেশ্যে বললাম, ও হা তাইতো। আমারই ভুল। কোন মেয়েছেলে নেই এ বাড়ীতে। এখানে তুমি কি করে থাকবে। ঠিক আছে । আমি দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে নাদিরা আমিন বললো, না , কথা টা আমি ও অর্থে বলিনি।

কোন অর্থে সে বলেছে তা ভেবে দেখতে গেলাম না। বললাম, তুমি যে অর্থেই বলো, আসলে কথাটা তো ঠিক। বাড়ীতে দুএকজন মেয়েছেলে থাকলে তবেই থাকা তোমার সম্ভব। বাড়ীতে মানুষ মাত্র দু'জন, তাও আবার দু'জনই পুরুষ মানুষ। এর মধ্যে তোমার থাকাটা দৃষ্টিকটুও বটে, অস্বস্তিকরও বটে।

নাদিরা তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বললো, আপনার দিক থেকে যদি তাই মনে

হয়, তবে কিছু বলার নই। নইলে আমার জন্যে তা অস্বস্তিকর একটুও নয়।

থমকে গিয়ে বললাম, মানে ?

এবার উত্তর দিলেন আমিন সাহেব। বললেন, এর তো আর মানে নেই ভাই ও এতবড়ই হতভাগী যে ওর গার্জেন বলতে এখন এ দুনিয়ার এক আমি, আর আমার পরই আপনি। এছাড়া আর তৃতীয় কেউ নেই। সেই আপনার কাছে থাকতেই যদি সে অস্বস্তিবোধ করে, তাহলে স্বস্তির সাথে থাকায় ওর আর স্থান কোথায় বলুন।

প্রশ্ন করলাম, তবে ওর আপত্তির কারণ ?

উত্তর দিল নাদিরা নিজেই। বললো, কারণটা অন্য কিছু নয়। আমরা আপনার সাহায্য সহানুভুতি চাই—এটা ঠিক। কিন্তু তাই বলে একেবারে আপনার ঘাড়ের উপর চেপে বসবো এটা কি ঠিক ? একজনের সহানুভুতির সুযোগ নিয়ে তাকে বিড়ম্বিত করে তোলাটা কোন পক্ষের জন্যই কল্যাণকর নয়।

কপট গাম্ভীর্যের সাথে বললাম, ওরে বাসরে। এত সুক্ষ্ম অনুভুতি নিয়ে আমার কাছে এসে তাহলে কাজ নেই বাবা। আমি অত মেপে চলতে পারবো না।

নাদিরা ফের অবিচল কণ্ঠে বললো, মেপে না চলাটা আপনার কাছে যতটা সহজ, আমাদের কাছে ঠিক অতটা সহজ বলেই কি মনে হয় আপনার ?

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, একশো বার। সংশয়ের যেটা আসল বিষয় তা নিয়ে যদি সমস্যা না হয়, তাহলে আর কথা কি ? আমার ঘর দোর সব ফাকা-ঢন ঢন করে বাড়ী। মানুষ পেলে আমরা যেখানে বর্তে যাই, সেখানে আবার আপত্তি কিসের ?

আমার ভাব লক্ষ্য করে আমিন সাহেব বোধহয় একটু অপ্রতিভ হলেন, বললেন, না, মানে- নাদিরা যা বলছে তাহলো, কতদিন আর আমরা আপনার—

আমি ঐ একই মেজাজে বললাম, গলগ্রহ হয়ে থাকবেন ? তা থাকতে আপনাদের বলছে কে ? আমাকে যদি স্রেফ আর পাঁচটি বন্ধুর মতোই মনে করে থাকেন, তাহলে আপনার পৃথক ভাবে ঐ যে পশ্চিমদিকের ঘরগুলো আছে, ওখানে উঠে সংসার খুলে বসুন। হাঁড়ি পাতিল যোগার করে আলাদা ভাবে চুলো জ্বালিয়ে দিন। অন্যখানে আপনাদের যেতে হবে কেন ?

আমার এই উত্তেজনার সামনে ওরা কথা খুজে পেলোনা। ওদের নীরব দেখে আমারও বেড়ে গেল জিদ। তাই আবার আমি বললাম, এতেও যদি সংকটটা না কাটে, অন্য বাড়িতে থাকলে যে ভাড়া দিতেন মাসে মাসে ওটা না হয় আমাকেই দেবেন। তবু অন্যত্র কেন যাবেন আপনারা ?

আমিন সাহেব শশব্যস্তে বললেন, ফরহাদ সাহেব। প্লীজ—প্লীজ—।

বইঘর.কম ও রোকন

নাদিরা হাত জোড় করে বললো, দোহাই আপনার। আমার ঘাট হয়েছে। অপরাধ হয়েছে। আমাকে মাফ করুন। আমরা কোথাও যাবোনা। ঐ পশ্চিমদিকের ঘরগুলোতেও নয়। এখানে এই ভাবেই থাকবো আর বসে বসে বক্স মিয়ার রাধাভাত খাবো। দেখি আমায় সরায় কে ?

আমি খুশী হয়ে বলালাম, 'জাস্ট লাইক এ গুড গার্ল। এই না একটা কথার মতো কথা। না কি বলেন আমিন সাহেব ?'

আমিন সাহেব স্মিতহাস্যে বললেন, 'আমার আর কি বলাবলি ভাই। আপনার কাছে এসেছি, আপনি যা করবেন আমরা তাতেই রাজী।'

উত্তেজনার ভাবটা একটু খাটো হতেই খেয়াল হলো, এটা আমি করলাম কি। তাদের কথায় কান না দিয়ে, দুর্বল জায়গায় আঘাত করে, আমার সাথে থাকতে তাদের বাধ্য করলাম ? এমন ইচ্ছা তাদের হয়তো আদতেই ছিল না। সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাই ঢোক গিলে বললাম, 'না মানে, এটাই যে পারমান্যান্ট ব্যবস্থা, তা আমি বলছিনে। কোন অসুবিধে কোন দিকে দেখা দিলে তখন আবার–'

শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে পারলাম না। নাদিরা আমিন দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'আর ওসব আবার টাবার নেই। আমার ঐ এক কথা দেখি আমাকে সরায় কে ?'

এবার হাসতেই হলো হো হো করে।

# চার

নাদিরা আমিন আসার পর ভাবলাম, এবার পায়ে বেড়ি পড়বেই। ছন্নছাড়া মন আমার ঘর ছাড়া হওয়ার আর কারণ খুঁজে পাবেনা। নাবিকহীন বলেই আমার মন তরণী এতদিন তীর খুঁজে পায়নি। নাদিরা আমিন এবার ঠিকই তীরে আনবে তরণী। শক্ত হাতে লঙ্গর গেড়ে বন্ধ করবে গতি। সাঙ্গ হবে অস্থিরতা। নাদিরার পোতাশ্রয়ে পথশ্রান্ত তরী এবার স্বচ্ছন্দে খুঁজে পাবে তৃপ্তিভেজা বিরামের নিরাপদ কুঞ্জ।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। কিছুদিন না যেতেই বুঝলাম, "হেথা নয়, হেথা নয়, ------ অন্য কোনখানে।" অল্পদিনেই ধরা পড়লো , পুরোপুরি দিকপ্রান্ত আমি। রূপ আছে নাদিরার। কিন্তু আমার মন চায় অপরূপ রতন। সেই আশায় অনেকদিন বসে রইলাম ঘরে। কিন্তু পেলাম না। নাদিরা যা দিতে পারে তা সাকুল্যে খাদ। সোনাবিহীন খাদের কোন কদর আছে কিনা আমার জানা

বইঘর.কম ও রোকন

নেই। তাই বাউড়ে ধাতের মনটা আবার বাইরে ছুটে বেরোনোর জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সুযোগটাও পেয়ে গেলাম অল্পদিনেই।

কিছু ভক্তবন্ধুর এক নাট্যানুষ্ঠানের দাওয়াত নিয়ে বাড়ীতে এসে হাজির হলো পত্রবাহক। তুলে ধরলো বন্ধুদের বিনয়ের এক বণনাতীত বিবরণ। সংক্ষেপে বলা যায়, উক্ত অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত ভক্তদের কৃতজ্ঞতার বাধনে এমনিই শক্ত করে বেঁধে ফেলবে যে, পর দুনিয়ায় গিয়েও যদি দৈবাৎ আমার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তাদের, আমার জন্যে প্রাণ পাত করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করবে না। এ লোভ সামলোতে পারে ক'জন। আনন্দে নেচে উঠলো মন। তাই নির্ধারিত দিনে, অনেক দূরের পাল্লা জেনেও বাড়ী থেকে বেরুলাম খুশীতে ডগমগ হয়ে। কিন্তু হাসির পর যে কান্না আছে, সেটা বুঝলাম পরে। ট্রেন যোগাযোগ নেই। গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর একমাত্র খেয়াতরী মটর শকট। এর আগে গো শকটই ছিল সংকট তারণের সবেমাত্র মাদুলী। ও হাঙ্গামা আর বর্তমানে নেই। ভবিষ্যতের গ্যারান্টি অবশ্য না দেয়াই ভাল। কারণ, গতিক বড় সুবিধের নয়। গ্রাম ছাড়া এই দূর দূরান্তের পথ গুলো রাঙ্গামাটিরই হোক, আর বেলে মাটিরই হোক, আগে তবু কারো কারো মন ভুলাতে পারতা। প্লাস্টারযোগে পাকা হওয়ার পর এরা আর মন ভুলায় না একজনেরও বরং প্রাণ উড়ায় সকলেরই। পার্সেন্টেজের প্রক্রিয়াটা প্রবলেম সৃষ্টি না করলে রাস্তার উপর জনগণের আস্থা অনেকখানি পোক্ত হতে পারতো। কিন্তু পথের ইষ্ট দিয়ে পেটের পুষ্টি সাধনের ব্যাপার স্যাপার ভেস্তে দিয়েছে সব কিছু। ফলে, পথগুলো পাকা করে পাশ ফিরে না দাঁড়াতেই খেগে ধরা রুগীর মতো কুচকে যায় পথগুলো। পার্সেন্টেজের পয়সাওলার সদগতি না হতে পথগুলো অধগতি নেমে আসে শের ধাপে। বেরিয়ে আসে হাড় হাড্ডি। অল্পদিন পরেই (অধিক ক্ষেত্রে) কারো সাধ্য নেই যে, সনাক্ত করে – এটা সদ্যনির্মিত পথ, না হিজ ম্যাজেস্টি হেনরী ফোর্থের আমলের হাড়গোর ভাঙ্গা রাস্তা। কাঁচা থাকতে বিবির কাছে শুধু "আসি গো" বলেই এসব পথে পা বাড়ালে চলতো। পাকা হওয়ার প্রাক্কালে যে ব্যক্তি মোহরানা মাফ না নিয়ে বাড়ী থেকে বেরোয়, তার মতো আহম্মক দু'টি পাওয়া দুষ্কর।

মোহরানার প্রসঙ্গ না থাকায় নির্ঝঞ্ঝাটে বেরিয়ে ছিলাম বাড়ী থেকে। বাসষ্ট্যান্ডে পৌঁছাতেই বাসের কন্ট্রাকটার সাহেব সাদরে তুলে নিলেন গাড়িতে। আদর করে বসিয়ে দিলেন সীটে। বাসের নাম পঙ্খীরাজ। ভাবলাম, রাজকীয় কায়কারবার। জার্ণিটা জমবে ভাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গল– সেই জার্নিটাই আর শুরু হয় না কিছুতেই। কারণ, আরো চড়নদার চাই। লোডিং এর একটা শেষ আছে সব কিছুরই। পরিমিত মাল উঠলেই সমাপ্ত হয় লোডিং। কিন্তু কতটি

বইঘর.কম ও রোকন

মানুষ উঠলে একটি বাস লোডিং শেষ হয় আমার তো নয়ই, এ তথ্য অন্য কারো জানা আছে বলে বিশ্বাস করিনা আমি। ঘন্টা দেড়েক ধরে চলতেই থাকলো লোডিং। সীটগুলো ভর্তি হওয়ার পর শুরু হলো দাঁড়ানো। শূন্যস্থান বলে বাসের অভ্যন্তরে যা কিছু বাড়তি স্থান ছিল পূর্ণ হলো তাও। তবু লোডিং পর্ব খর্ব হলো না একতিল। কন্ট্রাক্টরের ডাকে হাকে মনে হল এ পর্বের সূচনা হলো সবেমাত্র। ছাদ ভর্তি মাল। ওদিকে পথ নেই। কাজেই, ভেতরেই তুলতে লাগল মানুষ। তারা দাঁড়াতে লাগলো যত্রতত্র। প্রথমে এলোপাথারী–তারপর এ্যাটেনশান। নড়ন চড়ন বন্ধ, আরামে দাঁড়ানোর প্রশ্নই অবান্তর। শেষ পর্যন্ত প্যাকেটের মধ্যে সিগারেটের মতো বাসের মধ্যে মনিষ্যি নামক পদার্থ একে অন্যের বুকেপিঠে এমনই ভাবে সেটে গেল যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনে বক্ষঃস্থলের কিঞ্চিৎ উঠা নামাও চলে গেল সাধ্যের বাইরে। তবু যাত্রীর অভাবে কন্টাকটারের আর্ত্তির কিছুমাত্র ঘাটতি না দেখে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গেল বাস ভর্ত্তি লোক। চড়তি গলায় কুটুম্বসুলভ সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেও ফল না হওয়ায়, তারা চেপে ধরলো কন্টাকটারের গলা। পরিস্থিতি চলে গেল আয়ত্বের ওপারে। গতিক খারাপ দেখে ছুটে এলো ড্রাইভার। বারকয়েক হর্ণ বাজিয়ে ষ্টার্ট দিলো গাড়ী। সে স্টার্টটাও একখানা অভিনব স্টার্ট। থার্ড কি ফোর্থহ্যান্ড গাড়ী খানা স্ট্রার্ট নেয়ার অজুহাতে ইস্রাফিলের শিঙ্গার অধিক আওয়াজ তুলে যে পরিমান ধুম্র উদগিরণ করলো, তাতে জানা না থাকলে কিয়ামতের আলামত বোধে ভিমড়ী খেতো আশে পাশের মানুষ, –বিভৎস অগ্নিকাণ্ডরোধে ছুটে আসতো ফায়ারব্রিগেডের সমূদয় বাহিনী। জানা ঘটনা বলেই এসব কিছু ঘটলোনা আর নির্বিবাদে যাত্রা হলো শুরু। একে আহামরি রাস্তা, তার উপর বাসের এই অবস্থা। জার্ণির ব্যবস্থা যে বেশ জমকালোই হলো, এ সম্বন্ধে একবিন্দু সন্দেহ রইলো না। কিন্তু লক্ষ্য স্থল যার যেখানেই হোক, সত্যিকারের গন্তব্যস্থল যে কার কোথায়, এ ব্যাপরে নিঃসন্দেহ হতে পারে এমন কোন বাপের বেটা একজনও ছিল না গাড়ীতে। বরাতের জোরে হেলহেভেন হস্পিট্যাল–এসবের ডাক এড়াতে পারলে তবেই উঠে সে কথা।

ধাপে ধাপে লোড আনলোড আর ঘাটে ঘাটে জল যোগ করতে করতে রাজকীয় মেজাজে এগিয়ে চললো পঙ্খীরাজ। পাক্কা চার ঘন্টা বিশ মিনিটে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে পঙ্খীরাজ যখন মেন সড়কে উঠলো, তখন বেলা দেড়টা। হিসাব করে দেখলাম, গাড়ীর গতি নিদেন পক্ষে আরো দেড়গুন না বাড়লে, দিবা ভাগে তো দুরের কথা, রজনী দিপ্রহরেও গন্তব্যে স্থানে পৌছানো সম্ভব নয়। কারন স্থল পথ ছাড়াও সামনে পড়বে জলপথ দশ মাইল। শংকিত হয়ে

উঠেই আশ্বস্ত হলাম তৎক্ষণাৎ। ড্রাইভারটি বুঝি অন্তর্যামীই ছিলেন। চওড়া রাস্তায় উঠেই উনি চাবুক কষলেন কয়েক ঘা। গঁ গঁ করে লাফিয়ে উঠলো পঙ্খীরাজ। ছুটতে লাগলো অমিত বিক্রমে। গাড়ীর গতি আড়াইগুণে বৃদ্ধি পাওয়া দেখে মনের সুখে গুণ গুণ করে গাইতে লাগলাম, ' আজ হাসি কাল রোলানা দে না–'

নসীবের লিখন। আগামীকালের অপেক্ষাই রইলো না। 'রোলানা'র পালা এলো মুখের গান মুখে থাকতেই। পঙ্খীরাজের মেজাজ মর্জ্জি খোলসা হয়েছে ভেবে নিশ্চিন্তেই ছিলাম। ওটা যে তলে তলে বিগড়ে গেছে এতখানি, সেটা যদি তিল পরিমান আন্দাজ করতে পারতাম, তাহলে গান টান কোন কথা, জানটাকেই বাজী রেখে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়তাম চলন্ত অবস্থায়। মাইল দেড়েক ঐ ভাবে ছুটেই অকস্মাৎ বেকে বসলো পঙ্খীরাজ। প্রচণ্ড নিনাদ তুলে ধপাশ করে শুয়ে পড়লো আচমকা। প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম প্রথমে। পরে হুঁশ ফিরতেই বুঝলাম, কোন এক জরুরী এত্তেলায় আজরাইল এই মাত্র ফিরে গেল এখানে করণীয় অসম্পন্ন রেখে। আতকে উঠে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে দেখি চাকা একটা লেপ্টে গেছে মাটির সাথে আর ধুম্রকান্ডে চতুর্দ্দিক অন্ধকার। আরো খেয়াল করে দেখি, পঙ্খীরাজ পাকা রাস্তা পরিহার করে পাশের এক ইটের স্তুপে মুখগুজে হাত পা ছেড়ে দিয়েছে ইহ জনমের মতো পাশেই এক গভীর খাদ। অভিমান করে পঙ্খীরাজ যদি আর মাত্র হাত খানেক পাশের দিকে চাপতো, তাহলে জাহান্নামের দুয়ার যে পঙ্খীরাজের ছাদ ফেড়ে সামনে এসে দাঁড়াতো, এটা হলপ করে বলতে পারি। মায়ের দুধের দাম ছিল, তাই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।

একঘন্টারও অধিক কাল অস্ত্রোপাচার করে নাড়ীভূড়ি নিরীক্ষান্তে ড্রাইভার সাহেব নির্জ্জীব কণ্ঠে জানালেন, দফা রফা! পঙ্খীরাজের দেহে প্রাণসঞ্চার করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, অন্য ব্যবস্থা দেখুন।

মা'শা আল্লাহ! একদিকে মাথার উপর মধ্যাহ্নের অগ্নিবর্ষণ, অন্যদিকে চোখে সামনে অসংখ্য সরষে ফুল। জনবসতির চিহ্ন বা বৃক্ষরাজীর আচ্ছাদন কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এই ধুধু ময়দানে। থাকার মধ্যে যানবাহনহীন ঐ সুদীর্ঘ পথ, আর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর এই এক বাস যাত্রী। এমতাবস্থায় অন্যব্যবস্থা বলতে সবাই মিলে আত্মহত্যার মহোৎসব করা ছাড়া আর অন্য কোন কিছুই হাতড়িয়েই কেউ পেলাম না সেই মুহূর্তে।

হতবুদ্ধ অবস্থায় কাটতে লাগলো সময়। বাচ্চাকাচ্চার ক্রন্দন, মহিলাদের

বইঘর.কম ও রোকন

বিলাপ আর বৃদ্ধদের হা হুতাশের মধ্যে কতক্ষণ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম খেয়াল নেই, আচমকা পাল্টে গেল পরিস্থিতি। একখানা খালি ট্রাক সশব্দে এসে হঠাৎ করে থেমে গেল সামনে। ড্রাইভারটি স্বইচ্ছায় এগিয়ে এলো যাত্রিদের উদ্ধারে। অভিভূত হয়ে গেলাম, ট্রাক ড্রাইভারের বদান্যতায়। যদিও মালের ট্রিপ মেরে ফিরতি পথে কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের লক্ষ্যেই ড্রাইভারের এই দাক্ষিণ্য, এবং তার সেই দাক্ষিণ্যের দক্ষিণাটাও হেঁকে বসেছেন চড়তি হারেই, তবু তাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতেই দেখি- ট্রাক প্যাকড আপ। ভাড়ার অংকটাকে থোড়াই পরোয়া করে মানুষের উপর মানুষ উঠছে বস্তার উপর বস্তা রাখার মতো। সঙ্গে সঙ্গেই সোচ্চার হয়ে উঠে আবার নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। আরোহনের পরের কথা চিন্তা করতেই রি রি করে কুঞ্চিত হলো সর্বাঙ্গ। ঝুড়ির মধ্যে মাছ বোঝাই বৎ ট্রাকের মধ্যে বোঝাই হচ্ছে মানুষ। অতপর চলন্ত ট্রাকের ঝাঁকুনিতে একজন গড়িয়ে পড়বে অন্যজনের ঘাড়ে একের চরণামৃত সচরণ বর্ষিত হবে অন্যজনের মস্তকে এর ওষ্ঠদ্বয় অকারণেই স্পর্শ করবে অন্যের পৃষ্ঠদেশ। এহেন ফ্রি স্টাইল অঙ্গভঙ্গির প্রক্রিয়ায় কার হস্তপদের মনোরম পরশ যে কার ফেস কাটিং পাল্টে দেবে পুরোটাই, তা সবিশেষ ভেবে দেখার বিষয়। এ জিল্লতির চেয়ে মৃত্যু একটা অধিক কিছু ভয়ংকর - এমনটি মনেই উদয় হলো না।

সাধ্যের অধিক বোঝা নিয়ে চলে গলে ট্রাক। যাত্রীর পনের আনাই সাফ হলো এ কারণে। আবার শুরু হলো প্রতিক্ষা। আরো ঘন্টা খানেক পন্থের পানে চেয়ে থাকার পর বন্ধুদের আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দিলাম জলাভাবে কয়েক মুঠো ধূলো। নিশাবসানের আগে নাট্যানুষ্ঠানে পৌঁছানো আর জন মানবে সম্ভব নয়। জ্বীন পরীর কথা অবশ্য আলাদা। চিন্তা করে দেখলাম– "মুসাফির মোছরে আঁখি জল, ফিরে চল--------" ফিলোসফিই এখন সুধীজনের জন্যে সৎ যুক্তি।

www.boighar.com

আর শুধু সামনের দিকে নয়, পেছনে যাওয়ার একটা কিছু পেলেও বর্তে যাই ভাবতেই, কানে এলো শানাইয়ের সুর। লক্ষ্য করে দেখি, একটা বাস দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে সামনে। একটু পরই স্পষ্ট হলো বাজনা। হরেক রকম বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে শানই প্রধান সুর। কাছে এলো বাস। বাসটি সুসজ্জিত, সামনে সাইন বোর্ড, লেখা- শুভ বিবাহ। বাজনা আসছে বাসের ভেতর থেকে- বাজাচ্ছে ব্যান্ডপার্টি।

ভাগ্যের বৈপরীত্য বিচারে ঈর্ষায় ক্ষুব্ধ হলো অন্তর। ভাগ্যবান বরটি আরামে বসে আছেন গাড়িতে, নির্ভাবনায় ছুটে যাচ্ছে কাঙ্ক্ষিত জনের সান্নিধ্যে। চোখে তার রঙ্গিন স্বপ্ন, মনে তার সীমাহীন পূলক, পাশে তার সরস পরিবেশ, কাছে তার

বইঘর.কম ও রোকন

সুরের মূর্চ্ছনা। তার তুলনায় এই তেপান্তরের আমি কতই না সাদৃশ্যহীন। কোন প্রিয়জনের সান্নিধ্যের জন্যে নয়, নেহায়েতই প্রাণ বাচানোর তাগিদে কোন যানবাহনের এক কোণে স্থান পেলে কতই না ধন্য হই! আমার এই ভাব দেখে আলেমুল গায়েব মনে মনে হাসছিলেন, সেটা আমি বুঝতে পারিনি তখন।

দ্রুতগামী বাসটি আজগুবী থেমে গেল সামনে এসে। এমনটি প্রত্যাশা করার তিলপরিমান কারণও ছিলনা। কোন ব্যবসায়ী বাস নয়! সুসজ্জিত বিবাহের গাড়ী। নাকি বিগড়ে গেল এরও কলকব্জা! লক্ষ্য করে দেখি বাসের গায়ে নাম লেখা "রাজহংস"। মার কাটারী। পঙ্খীরাজের জ্ঞাতি গোত্র! তবে আর বিগড়ে যাওয়া বিচিত্র কি। ব্যাপারটা জানার জন্য এগুতেই দেখি পঙ্খীরাজের হেলপার আর রাজহংসের ড্রাইভার আলোচনায় মগ্ন। খোঁজ নিয়ে জানলাম, পঙ্খীরাজ আর রাজহংস একই মালিকের সম্পত্তি। এই হেলপার-ড্রাইভার সকলেই ঐ একই মালিকের কর্মচারী। ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো। পঙ্খীরাজের দুর্গতি দেখেই থেমে গেছে রাজহংস। আমাদের দুর্গতি দেখে নয়। বিপদে রীতি নাস্তি। ঐ আলোচনার মধ্যেই আমরা ধরে বসলাম হেলপারকে। রাজহংসের অভ্যন্তরে ফাঁকা ছিল অনেক সিট। শুধু বরযাত্রীদের অন্তরে কিছু বদান্যতার উদ্রেক হলেই সদগতি হয় আমাদের। কথাটি শেষ পর্যন্ত তুলেই ফেললো হেলপার। কিন্তু ব্যাপারটা তো আসলেই অস্বাভাবিক। পথের যাত্রী বরযাত্রীর গাড়ীতে উঠবে এটা কল্পনা করে কে ? তাই প্রস্তাবটা তুলতেই আপত্তি এলো ঘোরতর। সামনে বাজারে নেমে যাওয়ার ওয়াদা কারা সত্বেও বিশেষ সুবিধে হলো না প্রথমে। মরা কাকের চড়কে কি ভয়। হাল আমরা ধরেই রইলাম আপত্তির পর আপত্তি আসা সত্ত্বেও। একমাত্র অধ্যাবসায়ের গুণেই আমাদের বিপত্তিটা গুরুত্ব পেলো ধীরে ধীরে এবং শেষ পর্যন্ত বরপক্ষের সম্মতি এলো ড্রাইভারের মধ্যস্থতায়।

শশব্যস্তে উঠে পড়লো সকলে। ভীড়ের মধ্যে পেছনে আর স্থান না পেয়ে গাড়ীর মাঝখানে এক ফাঁকা ছিটে জানালার ধারে বসে পড়লাম। আমার আগে পিছে সকলেই বরযাত্রী। শুধু পুরুষই নয়, মেয়েও আছে আধা আধি। আপত্তি করলে আর উপায় নেই উঠা ছাড়া। ফাঁকা সিট শেষ। উঠতে হলে, দাঁড়াতে হবে হ্যান্ডেল ধরে। ভাগ্যগুণে খেয়াল করলোনা কেউ। তাই আপত্তির কোন সম্ভাবনাও আর রইলো না। একটু পরেই ছেড়ে দিল গাড়ী। আমি চোখ মুজলাম খোলা জানালায় ঠেশ দিয়ে।

ঝড়ের বেগে ছুটে চলছে গাড়ী। বাদ্যযন্ত্রে মূর্চ্ছনা ঝরে পড়ছে চারিদিকে। তন্ময় হয়ে শুনছি আর ভাবছি, যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি সেটা তো এখন অর্থহীন।

বইঘর.কম ও রোকন

সামনে গিয়ে ধরতেই হবে ফিরতি গাড়ী। তার চেয়ে বরং বদল করি উদ্দেশ্য। বেলা এখনও হাতে আছে অনেকখানি। সামনের বাজারে নেমে নদী বেয়ে চলে যাই দীর্ঘদিন না দেখা এক চেনা মুখের সন্ধানে। খোঁজ পেয়েছি ঐ নদীরই একটু উজানে ঘর বেঁধেছে সে। নিজের গাঁ হাতির বিলের মেয়ে। আমার গ্রাম সম্পর্কের নাতনী নাম সালেহা। নিজ গৃহে কোন বাচ্চা কাচ্চা না থাকায় সালেহাকেই কোলে পিঠে মানুষ করেছি তার বাল্যকালে। অশেষ পূণ্যে বলেই হোক আর রাহমানুর রহিমের অপার করুণা বশেই হোক, কোন এক আত্মীয়ের বিপুল বিত্ত পেয়ে সালেহারা গ্রাম ছেড়ে চলে যায় দূরান্তরে। সালেহার বয়স তখন বড়জোর ন' দশ বছর। তার অল্পদিন পরেই মাতাপিতা হারিয়ে আমিও হই গৃহ ছাড়া। পুরাতন পর্ণের মতো সালেহার স্মৃতি কালক্রমে বেমালুম খশে পড়ে অন্তরের বৃন্ত থেকে। সদ্যপ্রাপ্ত খবরঃ এক বাউন্ডেলের প্রেমে পড়ে পিতৃগৃহ পর হয়েছে সালেহার। প্রেমিকের হাত ধরে এই এলাকায় এসেই নাকি ঘর বেঁধেছে সে। সালেহার সখ ছিল কম, সাধ ছিল সীমিত, জিদ ছিল দুর্বার। তার পক্ষে এমনটি বিচিত্র নয়। বিত্তবানের মেয়ে হয়ে বিত্তহীনকে ভালবেসে যে ঘর বেধছে সালেহা-সে ঘর দেখার সাধ আমার প্রবল। বাউন্ডেলের বল্গাহীন জীবনে বাধনের আস্বাদন কতখানি হৃদয় গ্রাহী– এটা প্রত্যক্ষ করার এক অদম্য অভিলাষ আমাকে পেয়ে বসে খবরটি পাওয়ার পরই। সময় সুযোগ অভাবে এতদিন তা পূরণ করতে পারিনি। আজ ভাবলাম, সুযোগ যখন হলোই একটা, তখন মিটিয়েই নিই সেই দুর্ণিবার সখটা আমার।

তীব্র একটা 'ওয়াক' শব্দে চমকে উঠেই দেখি. কম্মকাবার! জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গল গল করে বমি করলেন আমার সামনে বসা এক মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা। চলন্ত গাড়ীর বায়ু প্রবাহে সেই বমনের বেশ খানিকটা ছিটকে এসে লেপ্টে গেল আমার কাধ, বাহু আর কর্ণমূলে। একটা ঘৃনা সূচক "এ্যাহরে" শব্দ করতেই যে মেয়েটি মহিলাটিকে সামলাচ্ছিল, সে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। একি তব রঙ্গ প্রভু. একি রঙ্গ তব! সে হেনা।

বিধাতা আমার বরাবরই বিদ্রূপমুখর জানতাম। কিন্তু এতখানি জানতাম না। অন্যজনের বেলায় উনি প্রিয়জনের সাক্ষাৎ ঘটান সুমধুর পরিবেশে। হয়, 'যমুনা কি ধারে' নয়, কুঞ্জবনের কিনারে। সেখানে বিহগের কুজন থাকে, ভ্রমরের গুঞ্জন থাকে, সখার হাতে বাঁশী থাকে, সখীর মুখে হাসি থাকে- আর থাকে উভয়ের চারপাশে এক অটোম্যাটিক কারফিউ- যার ফলে, মহামারীতে উজার হওয়া পল্লীর মতো সাক্ষাতের অঙ্গনটা নির্জ্জন থাকে আগে থেকেই। কিন্তু আমার ভাগ্যে জুটলো এই বিভৎস পরিবেশ। এই মুহূর্তে আমাদের উভয়ের মানষিক

অবস্থার অকৃত্রিম ব্যাখ্যা দিতে পারে, এমন সাধ্য অনুরাগ শাস্ত্র তো দূরের কথা তার স্রষ্টার পিতৃ পুরুষেরও আছে বলে বিশ্বাস করা শক্ত। উভয়ে উভয়কে দেখে প্রীত হবো আনন্দে। না এই করুণ অবস্থায় উভয়ে কাতর হবো দুঃখে-এর কোন কিছু স্থির না হতেই আবার ককিয়ে উঠলেন তার হাতে ধরা সেই ভদ্রমহিলা। পুনরায় বমনের খানিক অপচেষ্টা করে হেনার কোলে ঢলে পড়লেন উনি, ব্যস্ত করলেন হেনা সহ আরো অনেক বরযাত্রীকে। আমার অবস্থা দেখে জনৈক বরযাত্রী মন্তব্য করলেন, "এ্যাহ! এক্কবারে গুদরী লাট!" অন্যজন প্রশ্ন করলেন, মানে ? উত্তরে প্রথম জন বললেন, "মানে, ভদ্দর লোকের অবস্থা গয়া।" হো হো করে হেসে উঠলেন পার্শ্ববর্তী কয়েকজন। দ্বিতীয়জন বিজ্ঞের মতো বললেন, "তা হোক। উনিতো আর বরযাত্রী নন. কাপড় চোপড়ও এমন কিছু কেতা দুরস্ত নয়। একটু ধুয়ে নিলেই চলবে।" ফস করে অন্য একজন বললেন, "উনি ঐ বিপন্নদের একজন নন ? মাই গড! চান্স পেয়েই কোথায় গিয়ে বসেছে দেখেন! উচিত শিক্ষা হয়েছে।

শেষ কথাটি চাপা কণ্ঠে হলেও কান আমাদের এড়ালো না। বক্তার প্রতি চকিতে একটা রুষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চোখ ফেরালো হেনা। তার মুখমণ্ডলে বেদানার ছায়া স্পষ্ট।

গাড়ী থামাতেই ছুটে গিয়ে পানি আনলো একটা ছোকড়া গোছের হেলপার। চোখমুখ ধোয়াতেই কিছুটা সুস্থ হলেন ভদ্র মহিলা। আমি ইতিমধ্যেই কাগজ দিয়ে মুছে ফেললাম ময়লা। এবার পানির খোঁজে তোয়ালে হাতে নীচে নামার উদ্যোগ করতেই, নির্দেশ এলো হেনার। সে বললো, "একটু দাঁড়ান।" তারপর সে হেলপারটাকে হুকুম করলো, এই ছেলে, আর এক বালতি পানি আনো। জলদি।

পানি নিয়ে হেলপারটা ফিরে আসতেই হেনা আমায় বললো, "এবার যান, নীচে নেমে সব কিছু ধুয়ে নিন ভাল করে। এটা নেহাতই একটা দূর্ঘটনা। আমরা এর জন্যে খুবই দুঃখিত।"

হেনার কণ্ঠে অনুশোচনার স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হলো। আমি অগ্রসর হতেই ফের প্রশ্ন করলো হেনা, "সাথে গামছা তোয়ালে আছে, না একটা কিছু দেবো ?"

বললাম, "আছে।"

– মালপত্র আছে কিছু ?

– কিছু না, শুধু ঐ ব্যাগটা।

বইঘর.কম ও রোকন

– ঠিক আছে। ওটা আমি দেখছি। আপনি যান।

হেনার এই আগ্রহে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন অনেকেই। কিছু কিছু অতি উৎসাহীর নয়নে পলকহীন দৃষ্টি। শিরস্ত্রাণ নামিয়ে মাথা চুলকিয়ে প্রশ্ন করলেন বর ব্যক্তিটি স্বয়ং। বললেন, "কিরে হেনা, আগে থেকেই চিনিস নাকি উনাকে ?" সলজ্জ স্মিতহাস্যে একটুখানি মাথা হেলিয়ে হেনা জবাব দিলো– চিনি।

বজ্রপাত! পলকে পাল্টে গেল পরিস্থিতি। শুরু হলো ফিসফাস ও গুঞ্জরন। অনেকের চোখে-মুখে অপরিসীম বিস্ময়।

এর কারন ছিল যথেষ্ট। এক চিত্তহারী রূপে রূপবতী হেনা। প্রথম দিন হেনাকে দেখি আলো আধারের মধ্যে। প্রকাশ্য দিবালোকে আজ তার দীপ্ত শ্রী দেখে বার বার ভ্রম হচ্ছিল আমারই। এ ছাড়া হেনা শুধু বিদূষী, রূপসী আর সদাচারিণীই নয়, এক সম্ভ্রান্ত ঘরের সে এক ব্যক্তিত্ব পূর্ণ মেয়ে। ব্যবহারে সংযমী। বাক্যালাপে সংযত, স্বভাবে দৃঢ়। তার এই দুর্লভ চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে বহু বংশীয় ঘরের বিশিষ্ট সন্তানেরাও তার দিকে চেয়ে থেকেছে দূর থেকে, দগ্ধ হয়েছে প্রেম বহ্নির একক দহনে, বিড়ম্বিত হয়েছে দীর্ঘকাল ব্যাপী অনর্থক প্রতিক্ষায়। তার সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পায়নি একদিনও, তার সামনে এগুনোর সাহস হয়নি একজনেরও। আজও এই ভরা বাসে বিরল ছিলনা এমন বিদগ্ধ হৃদয়– অভাব ছিলনা তার কৃপাদৃষ্টির প্রত্যাশীর । তদুপরি, রূপসী তরুণী আর যে যতই থাকুক গাড়ীতে, হেনাই ছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

এহেন পরিবেশে এবং অতশত মহাজনদের লুব্ধদৃষ্টির মাঝখানে, এক ছন্নছাড়া পথিক এমন সৃষ্টিছাড়া খাতির পাবে হেনার – এটা একটা অপরিসীম বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি। তদুপরি, 'চিনি' বলে জবাব দেয়ার মধ্যে দিয়ে কিঞ্চিত অনুরাগের আভাসও যদি দিয়ে দেয় হেনা। তাহলে যে মানসিক শৃঙ্খলার বিপর্যয় ঘটবে– এ আর বিচিত্র কি।

গাড়ী থেকে নেমে হেলপারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, বিয়ে যাবে অনেক দূর। বর হেনার মামা। হেনার মায়ের চাচাতো ভাই। ভাবলাম, হেনারাই যখন সব, তারাই যখন কর্তৃপক্ষ, তখন এ নাটক আর এগুবে না বেশী দূর। ইতি হবে এখানেই। কর্তৃপক্ষের ব্যাপার নিয়ে অধিক দূর এগুতে আমন্ত্রিত অতিথিদের বিবেকে বাঁধবে। কিন্তু ও বাবা! গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, পুরানো ট্রাডিশন সমানে চলছে। আমাকে কেন্দ্র করে চাপাকণ্ঠে রসঘন আলাপ তখন তুঙ্গে। গাড়ীতে উঠার কালেই কানে পড়লো জনৈক মাঝবয়সী রসিকের খেদোক্তি,

"উড়ে এস জুড়ে বসলিরে বাপ।" গাড়ীতে উঠার পর সামনেই একজন প্রশ্ন করলো "হেনার সাথে ভাই সাহেবের আগে থেকেই পরিচয় আছে দেখছি! তা কতদিনের পরিচয় ? সাথে সাথেই অন্য একজন চাপা কণ্ঠে বললো, "সেটা উনাদের নিতান্তই আভ্যন্তরীণ ব্যাপার স্যাপার। এ নিয়ে তোমার এত গরজ কিসের বাবা ? প্রথম জন হতাশ কণ্ঠে জবাব দিলো, "তা অবশ্যই ঠিক।" দ্বিতীয় জন পাল্টা প্রশ্ন করলো, তবে ? নিজেদের শুনিয়ে নিতান্তই চাপা কণ্ঠে উত্তর দিলো প্রথম ব্যক্তি। অনুতাপের সুরে বললো, "তবে আর কি! শালা, এমন ছানা বেড়ালে খেলোরে।"

কথাটা শুনতে পেলাম স্পষ্টই। কিন্তু বলার কিছু নেই। কারণ এরা বরযাত্রী। মাতাল আর বরযাত্রীতে ফারাগ অতি সামান্য। প্রথম অবস্থায় লুপ্ত হয় কান্ড জ্ঞান, দ্বিতীয় অবস্থায় লোপ পায় মাত্রাজ্ঞান। বরযাত্রী হলেই সামান্যরা সেজে বসে অসামান্য, সকলেই মন দেয় মুন্সীয়ানায়। বখাটেরা নিজকে ভাবে রাজপুত্র কোঠাল পুত্র- বেকুবেরা ভূমিকা নেয় বাগ্মীর। ওদের সাথে বকতে যাওয়া অর্থহীন।

উঠে এসে সিটে বসতেই ছেড়ে দিলো গাড়ী। হেনা এবার সহাস্যে ঘুরে বসলো আমার দিকে। হাসি মুখে বললো, "কি আশ্চর্য! আপনি এসে বসে আছেন আমার পেছনে, টেরই পাইনি আমি।" হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো খেয়াল করিনি একটুও।

হেনা এবার চার্জ করলো আমাকে। বললো, কেন করবেন না ? একটা মেয়ের এত কাছে বসলেন, তবু একটু নজরও পড়লো না ?"

বললাম, "না, মানে আমিত আর জানিনে যে আপনি বসে আছেন। নজর পড়বে কি করে ?"

কি যেন একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল হেনা। গম্ভীর হলো একটু। পরে প্রসন্ন বদনে ধীরে ধীরে বললো, "এটাইতো বৈশিষ্ট্য আপনার! আর এজন্যেই তো আপনাকে আমার মনে পড়ে বার বার।"

তার হেয়ালীর প্রেক্ষিতে বললাম, "কথাটা ঠিক বুঝলাম না।"

আবার একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো হেনার মুখে। বলল, "থাক, বুঝার দরকার নেই । আপনার সাথে আবার যে সাক্ষাত হলো এই ঢের।"

অন্যকথা খুজে না পেয়ে আমিও তাকে সমর্থন দিয়ে বললাম, তা ঠিক। এভাবে হঠাৎ দেখা হবে আমাদের- এটা আমি কল্পনাও করিনি।

বইঘর.কম ও রোকন

হেনা ফের সঙ্গে সঙ্গে বললো, "আমার কিন্তু আশা ছিল, নিশ্চয়ই আপনি যাবেন একবার বাঘাবনে।"

এবার ঠেকে গেলাম পুরোপুরি। কিঞ্চিত পরিচিত এক রূপসী যুবতীর সৌজন্য আহবানের সুযোগ নিয়ে তার বাড়ীতে যাওযার আগ্রহটা অত্যুগ্র হলেও হতে পারে চিত্ত বৈকল্যের কারণে । কিন্তু তাই বলে সেই আগ্রহ চরিতার্থে নির্দ্বিধায় সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া একমাত্র লাজ লজ্জাকে খোলাবাজারে বিকিয়ে দিলেই সম্ভব, নচেৎ নয়। যদিও প্রেমের রাজ্যে লজ্জাটা গদ্যময় এবং সেক্ষেত্রে শেষ অবধি– "আমার ঘরে পড়তোনা ভাই শূন্য। বলে শোক গাথা গাওয়া ছাড়া গত্যান্তরও থাকে না, তবু লজ্জাটাকে একেবারেই পরিহার করার সাধ্যও যে আবার থাকেনা সকলের– এটাকে তাকে বুঝাই আমি কি দিয়ে। www.boighar.com

কিন্তু বোঝাতে তাকে হলো না । কিঞ্চিত নীরব থেকে হেনা নিজেই বললো, "আপনি গেলে অবশ্য খুশি হতাম। কিন্তু না যাওয়াতেও ক্ষুন্ন হইনি। বরং বলতে পারেন, খুশি হয়েছি আরো বেশি।"

আবার একটু নীবর থেকে বললো, "আপনার মত লোকের যে অত আগ্রহ থাকবেনা – ওটাও আমি অবশ্য বুঝে নিয়েছিলাম সেদিনই।"

বুঝেও না বোঝার ভান করে একটা অজুহাত খাড়া করলাম। বললাম, ঝামেলার পর ঝামেলা তো লেগেই আছে সব সময়। যাই কখন বলুন ?

বাধা দিলো হেনা। বললো, "থাক। সৃষ্টির একটা সুখ আছে ঠিকই। উল্লাসও আছে। কিন্তু মিথ্যার বেলায় নয়। এখন বলুন, যাচ্ছেন কোথায় এদিকে ?"

বিস্মিত হলাম হেনার এই বুৎপত্তি দেখে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, যাওয়ার কথা আর বলবো কি! যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম বাস বিভ্রাটের দরুন ভেস্তে গেল সেটা। এবার একটু অন্যদিকে যাবো ভাবছি।

হেনা বললো, "অন্যদিকে মানে ?"

– মানে সামনের ঐ বাজারে নেমে নদীর একটু উজান দিকে যাবো।

– সেকি। ওখানে কোথায় ? কোন যাত্রানাটক আছে নাকি ?

– না। যাত্রানাটক যেখানে ছিল, সেখানে তো যেতেই পারলাম না। ওখানে যাবো একজনের বাড়ীতে। মানে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের খোঁজে।

– আত্মীয়। কে আত্মীয় বলুন তো ? কোন গ্রামে ?

বইঘর.কম ও রোকন

– সমস্যা তো ওখানেই। সঠিক ঠিকানা জানিনে। একটু জেনে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আপনি ও এলাকা চেনেন নাকি ?

– চিনি না মানে ? ওখানে আমার খালার বাড়ি। খালার বাড়ীতে থেকে ওখানকার এক স্কুলে পড়াশুনা করেছি অনেক দিন। এই যে ইনিই আমার খালা। তার পার্শ্বে বসা সেই অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে দিলো হেনা। তিনি ঝিমুচ্ছিলেন। তার কথা উঠে পড়ায় চোখ মেললেন তিন। আমাকে একনজর দেখে নিয়ে হেনাকে প্রশ্ন করলেন,"লোকটা কে রে হেনা ?"

উত্তরে হেনা বললো, "আমাদের এলাকারই লোক খালা। পরিচিত মানুষ।"

ছোট্ট একটা "ও" শব্দ করে সিটে হেলান দিয়ে হেনার খালা চোখ মুজলেন আবার। চুপ চাপ বসে রইলাম কিছুক্ষণ। ছুটতে লাগলো গাড়ী কিছুক্ষণ নীরব থেকে হেনা আবার প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলো, "এমন পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়ান সব সময়– ঘর সংসার নেই বুঝি ?

ঈষৎ হেসে বললাম, "তা থাকলেই কি আর সব সময় ঘরে থাকে মানুষ ? সংসারীকেও অনেক সময় বেরুতে হয় বাইরে।"

হেসে ফেললো হেনা। বলল, "কথা বার্তায় তো মনে হয় জ্ঞান বুদ্ধি বেশ টনটনে। ও সব অকাজ ফেলে ভাল কাজে মন দিলে, লাভের পরিমান কি কম হয় কিছু ?"

বললাম, "দেখুন, লাভ লোকসানের হিসেবটা স্ট্যাটিক নয়, ডাইন্যামিক। ওটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারী করে। একজন যেটাকে নিতান্তই লোকসান বলে আফসোস করে, অন্যে আবার সেটাকেই চূড়ান্ত লাভ বলে গণ্য করে ধন্য হয় জীবনে। কাজেই, কোনটা অকাজ আর কোনটা ভাল কাজ, কোনটা লাভের আর কোনটা লোকসানের – সব সময় সেটা এক কথায় নির্দ্ধারণ করা মুসকিল।

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে মুখটিপে হাসতে! লাগল হেনা। বললো, "ও ব্বাবা। যা ভেবেছি; তা নয়। এযে দেখছি একেবারেই ধেনো মরিচ।"

একটা ঝাকুনি দিয়ে থেমে গেল বাস। লক্ষ্য করে দেখি, সেই উল্লেখিত বাজারে পৌঁছে গেছে গাড়ী। আরো দেখি, বাসের প্রায় বার আনা যাত্রী দম বন্ধ করে চেয়ে আছে আমাদের দিকে।

ইতি ঘটলো চলন্ত এই নাটকের। ওয়াদা মাফিক পঙ্খীরাজের যাত্রীরা সব নামতে লাগল বাস থেকে। দু' একজন বেখেয়ালীকে তাকিদ দিলো হেলপার। দেখে শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম আমিও। হেনা একটু হচকচিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো,

বইঘর.কম ও রোকন

"এখানেই নামবেন ? বলাম, হ্যাঁ, এগিয়ে তো আর লাভ নেই।" নীবর হলো হেনা। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে উদাস কণ্ঠে বললো, তা বটে।

অগ্রসর হতেই হেনা আবার প্রশ্ন করলো, "আমার চিঠিটা কি পেয়েছিলেন ?

সম্মতি জানিয়ে বললাম, "হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে হেনা বললো, "এরপর কোন চিঠি পেলে উত্তর দেবেন চিঠির। চিঠি লিখে চিঠির উত্তর পাওয়ার আশা সব মানুষই করে। – খেয়াল থাকবে তো?"

– 'থাকবে'– বলে আশ্বাস দিয়ে আমি ধীরে ধীরে নেমে এলাম বাস থেকে।

পর্বতের মূষিক প্রসব পর্ব সমাপ্ত হলো এই ভাবে। একান্তই কাম্য এই সাক্ষাতের পর সাকুল্যে যা পেলাম, তাকে কিছু "ম্যাটেরিয়াল গেন" বলে গণ্য কারা যায়না। লাভের মধ্যে লাভ হলো উঠের নাকের ডগার-সামনে মূলোর ডাটা ঝুলে থাকা। অর্থাৎ চিঠি পেলে পেতে পারি দু'একটা। লেটার ফ্রেন্ডশীপ। তাই যদি হয় , যাত্রা নাটকের লোক তো আমি , এটাইবা তার কম বদান্যতা কিসে।

# পাঁচ

দুনিয়া একটা রঙ্গমঞ্চঃ এ দুনিয়ার সকলেই অভিনেতা ও অভিনেত্রী। শেকসপীয়ারের বাণী। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল। ষোড়শ শতাব্দীর ভিন দেশী লোক বলেই এটা বলে পার পেয়েছেন। এই শতাব্দির এদেশীয় লোক হলে বুঝতে পারতেন ঠ্যালা। এ মন্তব্যের দরুণ পিঠের ছাল উঠুক আর না উঠুক, আসামীর কাঠগড়ায় উঠতেই হতো তাকে মানহানীর মোকদ্দমায়। এদেশে এমন লোক ভুরিভুরি আছেন, যারা চুরি জুচ্চুরীর অপবাদও খোশহালে সইতে রাজী, কিন্তু ওটি নয়। অভিনয়ের সংশ্রব, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ– যে ভাবেই হোক, তাদের স্পর্শ করার বিন্দু মাত্র সম্ভাবনা দেখা দিলেই ভিমরী খান তারা– তাদের মানের গাছ উপড়ে যায় গোড়া সমেত। গরীবের গম গুদাম সমেত গায়েব করে ধরা পড়লেও, তার জন্যে দু'দশ হাজার আক্কেল সেলামী দিতে হলেও বা তা নিয়ে কিছু মন্দ লোক দু'টো মন্দ কথা বললেও মান যায় না তাদের। জালজুচ্চুরীর দরুণ দু'চার ঘা ইদংমিদংও তাদের কাছে মামুলী বাত। কারণটা অন্য কিছু নয়। এসকল

বইঘর.কম ও রোকন

অপকর্মের ইনডাইরেক্ট স্যাংকশান আছে আমাদের মহানুভব সমাজের। তা না থাকলে, হত্যা-লুট-মিথ্যাচার সমানে চালিয়ে কিছু গোলাপজল গায়ে ছিটিয়ে মহাপ্রভুর পদ পেতোনা মার্কা মারা পাষন্ডরা। অনাথের অর্থ মেরে আর্তের শোকে দু'টো গরম গরম বুলি আওড়ালেই জন নেতার মান পেতোনা শয়তানের দোসররা। কামরিপুর খেদমতে অগনিত কূল নারীর একুল ওকুল দুই কুলই নির্মূল করার পর তিলক টুপি ক্রুশ পরলেই ধর্মের অবতার সেজে দশের মাঝে বসতে পারতো না কলির কেষ্ট মিয়ারা। এ সমাজে বাধা নেই কিছুতে। পরকাল বিঘ্নিত হওয়ার কারণও নেই এ সকল কর্মের দরুণ। কিন্তু তাই বলে অভিনেতা অভিনেত্রী–মানে যাত্রা নাটক থিয়েটার। সরাসরি বয়ে যাওয়াদের ইতরামী। ও ডিয়ার ইস্রাফিল– শিঙেটা তোমার রাখলে কৈ ?

বলার কিছু নেই। এদেশে রুচির প্রশ্নটা যত তীব্র এ ব্যাপারে বোধকরি এত তীব্র আর কোন ব্যাপারে নয়। কাজেই যে দেশে যেমন চলে তেমনি ভাবে চলাটাইতো বাঞ্ছনীয়। বিরুদ্ধ গেলে চলবে কেন ? সংস্কৃতির অনুশীলনকে এ সমাজ হৃষ্টমনে গ্রহণ করতে পারেনি অদ্যাবধি– এটাতো আর মিথ্যা নয়। রাজধানীটাই দেশ নয়। দেশটা আরো বড়। রাজধানীতেই যে এর নিরঙ্কুশ সমর্থন আছে এটাও তো বলার জো নেই জোর দিয়ে। এছাড়া সংস্কৃতিরও তো দোষ আছে নিজস্ব। এটা পরমার্থের অন্তরায় (সত্য মিথ্যা জানিনে বা তানসেনের কথাও আনছিনে) অর্থ উপার্জনের প্রতিবন্ধক বৈষয়িকতার বৈরী। কাজেই শুধু পরকালদর্শীরাই নন, ইহকাল দর্শীরাও অভিনেতা সন্তানের মুখদর্শনে নারাজ। বিত্তের সাথে বন্ধুত্ব নেই যার, সমাজ যার বিরুদ্ধে, সেই সংস্কৃতিকে সমর্থন দিতে গেলে অনেক সমাজপতিরও ক্ষুন্ন হয় সামাজিক মর্যাদা। পরকাল পড়ে মরুক, ইহকালের ইষ্ট দেখে না কে ?

ফলাফল করুণ। এ দেশে নাট্যানুষ্ঠানে বা সংস্কৃতির একপ্রকার কর্মকান্ডের সাথে জাড়িত হলেই কিছু সুনির্দ্দিষ্ট পরিচয়ে চিহ্নিত হয় মানুষ। মুছে যায় তার অতীত। হারিয়ে যায় সে নিজে। কারাগারে থাকলেই যেমন কালক্রমে লোপ পায় তার নাম, থাকে শুধু নাম্বার। অভিনয়ে নামলেই তেমনি বদলে যায় তার আইডেন্টিটি, উপাধি হয় বেদীন, বয়ে যাওয়া বাউন্ডেলে। তার চরিত্র , পান্ডিত্য, বংশ, বিত্ত, যত উচ্চ মানেরই হোক, তাতে কিছু এসে যায়না। নব নব অভিজ্ঞতায় এ প্রত্যয় সমৃদ্ধ হয়েছে আমার, দৃঢ় হয়েছে বার বার। আর একবারও তা হলো হেনার কাছে বিদায় নিয়ে বাস থেকে নেমে আসার কয়েক ঘন্টায় মধ্যেই।

বইঘর.কম ও রোকন

বাস থেকে নেমে ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায় গেলাম এক রেষ্টুরেন্টে। যা পেলাম তাই দিয়ে নিবৃত্ত করলাম জঠরজ্বালা। এবার করণীয় নির্ধারণে শুরু হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব। সালেহাকে খোঁজ করার পূর্বের সেই মনোবল নিস্তেজ হয়ে নিভে যাওয়ার অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এখন। দিবাভাগ সংকীর্ন সূর্যাস্ত সন্নিকট কোন অজ্ঞাত ঠিকানায় পা বাড়াবার পক্ষে নিতান্তই প্রতিকূল পরিস্থিতি। রজনীর অন্ধকারে গ্রামাঞ্চলের বন বাদাড়ে ঢুকে বেঘোরে প্রাণ দেয়ার শংকাটা প্রবল হচ্ছে ক্রমেই। অপর দিকে, ফিরে যাবার পথও নেই রজনী প্রভাতের পূর্বে । এই গ্রামগঞ্জের বাজারে রাত্রি যাপন করতে হলে অবস্থান করতে হবে হোটেল নামক কতকগুলো খুপরী ঘরে। তার পরিণামও ভয়ংকর। সুখশান্তির যত কথাই থাক না ওদের সাইন বোর্ডে, বাস্তবে তার অস্তিত্ব বিশল্যের মতই বিরল। বরং সাইন বোর্ডে যা নেই, সেই অশান্তির অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এক ফোঁটা। জায়গা দিয়ে হোটেল মালিক পেছন ফিরে না দাঁড়াতেই আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে ছারপোকা আর মশককুল। স্ত্রী-পুত্র পরিবার, ভ্রাতা ভগ্নি নীতি ও প্রণাতী সমভিব্যহারে তাদের সারা রাত্রির নিরলস তৎপরতায় আর বদ্ধঘরের ভ্যাপসা গরমে অবস্থানকারীর ওষ্ঠাগত প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি রবে দেহ ছেড়ে পালাবার পথ খুজবে হোটেলের দেয়াল ভেঙ্গে। জলে কুমীর, স্থলে বাঘ। হিসেব করে দেখলাম ছারপোকা আর মশক কুলের ভোগ্য হওয়ার পরিবর্তে বনবাদাড়ে বাঘ সিংহের ভোগ্য হওয়া অনেকখানি ইজ্জতের কথা। তাই দ্বিধাদ্বন্দ দূর করে পথ ধরলাম নদীর ঘাটের উদ্দেশ্যে।

ঘাটে পৌঁছে মাঝি মাল্লার খোঁজ করছি আর ভাবছি-কিঞ্চিত সন্ধানও যদি দিতে পারে কেউ উঠে পড়বো তারই নায়ে। এমন সময় হঠাৎ এক বিগলিত কণ্ঠের উল্লাসিত "ওস্তাদ ডাকে পিছন ফিরে দেখি, আব্দুল্লাহ। মায়ামঞ্চ অপেরার ডাকসেটে নায়ক আব্দুল্লাহ।

নায়কের ভূমিকায় আব্দুল্লাহর হাতে খড়ি আমার হাতেই। আমার এই বেখাপপা জীবনের এক বিশিষ্ট পর্যায়ে মায়ামঞ্চ অপেরায় বেগার খাটি কিছু দিন। পাটের চাকরী মাঠে মারা যাওয়ার পর যখন জোরদার ভাবে জড়িয়ে গেছি নাট্যাঙ্গনের সাথে, অভিনয়ে দক্ষতার এক অবাস্তব প্রশংসায় যখন উত্তপ্ত কর্ণমূল, সামাজিক বয়কোটকে যখন ড্যাম কেয়ার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি যদেচ্ছা ঠিক সেই সময় এক দূরাঞ্চলে সামনে পড়ে মায়ামঞ্চ অপেরার প্রস্তুতি অভিনয়। বাইরে কোথাও বায়না নেয়ার আগে প্রতিদলই মঞ্চস্থ করে দেখে প্রতি পালার প্রস্তুতি। স্বভাবগত কৌতুহলের বশেই ব্রেক করলাম জার্নি, ঢুকে পড়লাম প্যান্ডেলে। লোকে লোকারণ্য। কোথাও সিট না পেয়ে অবশেষে বসলাম গিয়ে গ্রীণরুমের কোলঘেঁসে। অভিনয় দেখার কালে কথায় কথায় আলাপ হলো পার্শ্বে বসা এক

ভদ্রলোকের সাথে। চলমান অভিনয়ের দোষক্রটির কথা উঠতেই ঝুঁকে পড়লেন ভদ্রলোক, আমাকে চেপে ধরলেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার জন্য। যা কিছু লক্ষ্য করলাম বলে গেলাম সব কিছুই। বিশেষভাবে জোর দিলাম পার্শ্বচরিত্র আব্দুল্লাহর সম্ভাবনার উপর। বললাম, "অপূর্ব ন্যাক থাকা সত্বেও শুধু মাত্র গাইডেন্সের অভাবে মার খাচ্ছে বেচারা।" কিন্তু হায়রে কপাল। যার কাছে অভিনয়ের এত দোষ ধরলাম, পরিচয় নিয়ে দেখি– তিনিই দলের ডাইরেক্টর। তিনিই দলের প্রোপাইটর ও একমাত্র স্বত্তাধিকারী। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়, আচরণে অমায়িক, জাতিতে কায়স্থ। দেখলাম তিনি শুধু গুণীই নন, জ্ঞানীও বটেন। অভিনয় শেষে উনি ধরে বসলেন আমাকে, জানতে চাইলেন পরিচয় এবং আমাকে একজন বিশেষজ্ঞ বিবেচনায় তার রিহেয়ারসেলে উপস্থিত থাকার জন্যে তুলে ধরলেন সবিশেষ অনুরোধ। হাতে কাজ ছিলনা তেমন, থাকার ঠাঁইও ছিল না নির্দ্দিষ্ট। তদুপরি আর্ট অব ড্রামার উপর পন্ডিতি করার নেশাটাও পেয়ে বসলো সবলে। তাই, যথাসম্ভব আত্মপরিচয় এড়িয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে ভদ্রলোকের বাসগৃহেই গেড়ে নিলাম আস্তানা।

www.boighar.com

কয়দিনেই জমে উঠলো ঘনিষ্ঠতা। মোহড়ায় সাহায্য করার মধ্যে দিয়ে আরো উষ্ণ হলো সম্পর্ক। অভিনয় টেকনিকে কিছু আকর্ষণীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করে মুগ্ধ হলেন ভদ্রলোক। ফলাফল চিরাচরিত। এতে বৃদ্ধি পেলো আমার এই অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ। আমাকে নায়ক পোষ্টে বহাল করার সম্ভাব্য সকল চেষ্টা ব্যার্থ হওয়ার পর, অবশেষে ডাইরেক্টর অখণ্ড দায়িত্বটাই উনি আমার কাধে তুলে দিলেন কয়েক দিনের জন্যে । এই সময়ে এক নতুন পালায় আব্দুল্লাহকে খাড়া করলাম নায়কের ভূমিকায়। তাকে গড়ে তুললাম অন্তরের সর্ববিধ মাধুরীর সমন্বয়ে। আশাতীত সাড়া দিলো আব্দুল্লাহ এবং অল্পদিনের মধ্যেই তার অভিনয়ের প্রশংসা মুখে মুখে ফিরতে লাগলো হটকেকের মতো। এতে ফল ফললো আশানুরূপ, নায়কের পদ তার নির্বিবাদে কায়েম হলো মায়ামঞ্চ অপেরায়।

সেই থেকেই আব্দুল্লাহর ওস্তাদ হলাম আমি। তার অপরিসীম ভক্তি ও অসামান্য কৃতজ্ঞতার স্রোত সেই থেকেই বাধ ভাঙগা নদীর মতো আমার পিছে ছুটতেই আছে অবিরাম। পথে প্রান্তে দৈবাৎ দেখা হলে তার সাথে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর হয় প্রতিবারেই।

আব্দুল্লাহ সুন্দর, সুঠাম ও সৎস্বভাবের দীলখোলা মানুষ। এক বুনিয়াদ মোল্লা বংশের বি, এ, পাশ ছেলে। বিত্তবান পিতার একমাত্র সন্তান। বিষয় বিত্তের অভাব ছিল না পিতার। অভাব ছিল সন্তানের সেই বিষয় বিত্তের উপযোগী মনটার। পরিবারের সবাই চাইলেন, পূর্ব পুরুষের জাত ব্যবসাটা জোরদার ভাবে জাকিয়ে

বইঘর.কম ও রোকন

তুলুক আব্দুল্লাহ। চেহারা আছে, শিক্ষা আছে, সুন্দর-সৎ আচরণ আছে। শুধু জাতব্যবসাকে জাকিয়ে তোলা কেন, চাই কি মোল্লা থেকে বংশটাকে পুরোপুরি পীর বংশেই পার করবে আব্দুল্লাহ। এমনই আশা সকলের। কিন্তু সকলের সকল আশা নস্যাৎ করে হাল আমলের বি, এ, পাশ আব্দুল্লাহ পা ফেলালো উল্টো পথে। ফলে, জাত ব্যবসাকে জাকিয়ে তোলা তো দূরের কথা, সে জাত খোয়ালো নিজেরই। মোল্লা মুন্সীর ছেলে নাট্য মঞ্চ আকড়ে ধরা শুধু পরকালের ভিটে চষে সর্ষে বুনাই নয়, বিরাজমান সোস্যাল ধর্মে এটা প্রায় নর হত্যার সামিল। একটা অমার্জনীয় অপরাধ। সন্তানকে শোধরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন পিতা। ভয় দেখালেন, ভরসা দিলেন, বিভিন্নমুখী চাপের সৃষ্টিও করলেন তিনি প্রচুর। কিন্তু ফল হলোনা কিছুই। বিত্ত বিমুখ সংস্কৃতির সর্বনেশে নেশায় সন্তান তখন একেবারেই বুদ। ফলে পিতা যতই টেনে ধরলেন পেছনে, পুত্র ততই এগিয়ে চললো সামনে। লেশ মাত্র ভাবান্তর তার ঘটলোনা। দুর্মতি সন্তানের সুমতি ফেরাতে যখন একেবারেই অক্ষম হলেন বাপ, তখন আর শাপ অভিশাপ না দিয়ে সন্তানকে খাসদীলে সপে দিলেন শয়তানের হাতে। অতঃপর তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন গীট তোলা লাঠি, হুংকার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন গেটে। চোর বদমায়েশ মোনাফেক, আর যেই তার বাড়ীতে ঢুকুক। বাপের পণ হলো শয়তানের চেলার মাথা তিনি স্বহস্তে চৌচির করবেন সেটা তাঁর গেটে গলানোর বিন্দু চেষ্টা করলেই। সাত পুরুষের উঁচু মাথা নীচু করলো যে, তার মাথার প্রতি আর তিল পরিমান মায়া নেই পিতার। এর উপর আর কথা কি! সেই দিনই গেট থেকে এ্যাবাউট টার্ণ করে পিতৃগৃহ চিরতরে ত্যাগ করলো আব্দুল্লাহ। সে ভিন এলাকয় চলে এলো সগৃহ রচনা করে নিগ্রহহীন বসবাসের বাসনায়। সেই থেকে অদ্যাবধি তার কোন সম্পর্ক নেই পিতৃগৃহের সাথে। তা নিয়ে বিন্দু পরিমান ক্ষোভও নেই তার। স্বাধীনভাবে বসত বাড়ী স্থাপন করে মুক্ত বিহঙ্গের মতো সে এখন পাখা মেলে বিরাজ করছে নাট্যাঙ্গনের চত্বরে। ব্যতিক্রম একটাই। নামাজ সে কাজা করে না পারত পক্ষে।

নদীর ঘাটে আমার উপর নজর পড়তেই "ওস্তাদ" বলে আওয়াজ দিলো আব্দুল্লাহ। দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সে আমার কাছে ছুটে এলো পড়িমরি অবস্থায়। আমাকে পেয়ে সে চাঁদ পেলো হাতে। তার চোখে মুখে উল্লাসের প্লাবন। কাছে এসেই সে বলতে লাগল "আরে ওস্তাদ।" আপনি! কি আশ্চর্য! আপনি এখানে! কি ব্যাপার ? কখন এলেন ? কোত্থেকে ? কেমন আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার প্রশ্ন করার ধরণ দেখে মনে হলো –'চাইল্ডস ইজি গ্রামার' এর

ইন্টারোগেটিভ ও এক্সক্লেমেটরী সেনটেন্সের চ্যাপ্টার দু'টোকে এক সাথে খিচুড়ী পাকিয়ে সে গড় গড় করে পরিবেশন করছে থার্ড পন্ডিতের কাছে। অদম্য হাসির বেগ অতিকষ্টে চাঁপা দিয়ে আমি সংক্ষেপে ব্যক্ত করলাম আমার অভিপ্রায়। শুনেই আবার উল্লাসে নেচে উঠলো আব্দুল্লাহ। চীৎকার করে বললো, মারছক্কা," চমকে উঠলাম আমি। চমকে উঠলো অনেকেই। বলেই চললো আব্দুল্লাহ, "এবার আপনি যাবেন কোথায় ওস্তাদ ? আজ আর ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন নাই। দিনতো দেখি। দিন দিন, ব্যাগটা আমার হাতে দিন।"

এক রকম জোর করেই সে কেড়ে নিলো ব্যাগ। আমি কিছু বলার আগেই সে পুনরায় বললো, "আমার বাড়ীও ঐদিকেই। আগে আমার বাড়ী চলুন। সন্ধ্যেতো হয়েই এলো। রাতের আধারে আর খুঁজতে যাবেন কোথায় ? তার চেয়ে বরং কাল সকালে আমি নিজেই খুঁজে দেবো তাদের।

হক কথা। রাত্রিকালে খোঁজার প্রশ্ন অবান্তর। রাতে আমাকে থাকতেই হবে কোথাও। সেটা যদি আব্দুল্লাহর মতো ভক্তের গৃহেই হয়- এর চেয়ে আর উত্তম কি। এক কথায় রাজী হয়ে চলে এলাম আব্দুল্লাহর দৌলতখানায়।

তার দৌলতহীন দৌলতখানা একেবারেই ঘাটের উপর। গৃহটি ছোট খাটো। পরিবারটি ক্ষুদ্রাকার। সাহেব, বিবি, গোলাম। অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী ও একটি বয়সার্ভেন্ট। প্রচুর আছে বাপের। শুনলাম, আছে নাকি শ্বশুরেরও। তারাই তার ওয়ারিশ। কিন্তু তাদের বর্তমানটা টানা পোড়নের সামান্য একটু উপরে। যাত্রাদলে ছয় মাসে সিজন। সিজনে যা পায় সে, তা দিয়ে এই ছোট্ট সংসারটা চলে যায় মোটামুটি।

গৃহে পৌঁছেই গৃহিনীকে তলব দিলো আব্দুল্লাহ। চাকরটা দু'টো চেয়ার এনে পেতে দিলো বারান্দায়। একটু পরেই অবগুণ্ঠনাবত আব্দুল্লাহ পত্নী লণ্ঠন হাতে হাজির হলো সামনে। ওস্তাদকে সসম্মানে সালাম করার হুকুম পেয়ে "আসসালামু আলাইকুম" - বলে হাত তুলে আমার দিকে চাইতেই তার মুখের কথা আটকে গেল মুখে, তোলা হাত তোলা রইলো শূন্যে, অলক্ষ্যে খশে পড়লো অবগুন্ঠন। সে এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলা প্রস্তর মূর্তির মতো। আমার অবস্থাও তদ্রূপ। তবে আমি তাকে চিনতে পারলাম মুখাকৃতি দেখেই। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, আমি ফরহাদ, ফরহাদ আহমেদ। "এতক্ষণে দম সরলো মেয়েটার। সে উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "দাদু"। এবার নিঃসন্দেহে হয়ে বললাম, সালেহা! তুমি। "সে ঐ একই ভাবে বললো, দাদু আপনি এখানে। কোথা থেকে ? কেমন আছেন ?"

বইঘর.কম ও রোকন

আব্দুল্লাহর আনন্দ তখন দেখে কে! সে চীৎকার করে বলে উঠলা, "আরে ওস্তাদ, আমিই আপনার নাত জামাই, আর এই আপনার সেই কোলে পিঠে মানুষ করা নাতনী। মা গেড়ালী-খট খট।" বলে সে সত্যি সত্যিই মেঝেতে জুতো ঠুকে এগিয়ে এল সামনে। বললো, দিন দিন, পা দু'টো এগিয়ে দিন,। বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে বউকে সাথে নিয়ে কদমবুচি করলো

আমি অসাড় হয়ে থপ করে বসে পড়লাম চেয়ারে। হতবুদ্দের মতো ভাবতে লাগলাম- এই আব্দুল্লাহর সাথেই বিয়ে হয়েছে সালেহার! এই আব্দুল্লাহই সেই বাউন্ডেলে! এই আব্দুল্লাকে ভালবাসার জন্যই পিতৃগৃহ ছাড়তে হলো সালেহাকে। বন বন করে ঘুরতে লাগলো মাথা। আব্দুল্লাহ এক বিখ্যাত অপেরার সুবিখ্যাত নায়ক। বাংলাদেশের নায়কের রোল কালিয়া পিরেতরা কৃষ্ণকায় প্রেতেরা পায়না। রাজপুত্রের চেহারা চাই। কাজেই আব্দুল্লাহর চেহারা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এছাড়া, স্বভাবে চরিত্রে, গোত্র বংশে, বিদ্যায় বিত্তে বিশ ত্রিশ গায়ের মধ্যে আব্দুল্লাহ এক উজ্জল নক্ষত্র। বর হিসাবে আব্দুল্লাহ যে কোন কুমারীরই কাম্য। যে কোন কন্যার পিতারই প্রার্থীনীয়। মুখ খুললে, সালেহার বাপের চেয়েও অনেক জাদরেল জাদরেল বাপই আব্দুল্লাহর বাপের মন তুলতে ক্ষয় করতেন জুতোর তলা। যাত্রায় নামার পরিবর্তে জঘন্য অপরাধে জেল খাটার পরও বিয়ের কথা উঠতো যদি আব্দুল্লাহর এই বরের জন্য সালেহার বাপ আর পাঁচটা মেয়ের বাপের সাথে ডুয়েল লড়তেও রাজী হতেন, এটা প্রায় হলপ করেই বলা যায়। সবই ঠিক আছে কিছুই খোয়া যায়নি। শুধু সখের বশে অভিনয় খাতায় নাম লিখেছে আব্দুল্লাহ। এতে করেই নস্যাৎ হলো সব। তাকে ত্যাগ করলেন পিতা শ্বশুর উভয়েই! আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ থেকে এক লাফে নেমে এলো অধম-অতি অধমে! সব কিছু মুছে গিয়ে তার পরিচয় হলো বাউন্ডেলে!

চোখের পাতা ভারী হলো আমার! মনে মনে বললাম, "হায় আল্লাহ। তোমার পেনালকোডে ধারা কি ঐ একটাই ? ঐ এক অপরাধের উপর ভিত্তি করেই পাপ পূন্য, বেহেস্ত দোযখ ? যদি তাই হয়, তাহলে একটা বাদে নিভিয়ে দাও বাকী দোজখের আগুন। অপেরার পর অপেরা ঝেটিয়ে এক সাথে তুললেও ঐ এক দোজখই পূরণ হবে না তোমার।"

আমাকে গুম মেরে বসে থাকতে দেখে আব্দুল্লাহ পাশে বসে প্রশ্ন করলো, "কি হলো ওস্তাদ, আপনি এত গম্ভীর হয়ে গেলেন যে ?"

একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "আব্দুল্লাহ, এ দেশে সংস্কৃতির যথার্থ মূল্যায়ন কোন দিনই হলো না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর দেখিনে।

আব্দুল্লাহ আমার দিকে ঝুকে পড়ে বললো, "হঠাৎ একথা বলছেন কেন ওস্তাদ?"

বললাম, "কথাটা মনে এলো তাই।" আব্দুল্লাহ আবার বললো, "যদি তাই হয় তাহলে আমি বলবো, আপনার এই অভিযোগ পুরোপুরি ঠিক নয় ওস্তাদ। কর্মক্লান্ত জীবনের অবসাদ মুছে দিতে সংস্কৃতির অবদান কেউ অস্বীকার করে না। এ ছাড়া অবসর বিনোদনের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসাবেও আমরা কাজে লাগাই সংস্কৃতিকে ?"

একটু ম্লান হেসে বললাম, এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিই এদেশে সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটিয়েছে আব্দুল্লাহ। সংস্কৃতির স্রেফ এই ধরণের মূল্যায়ন একটা জাতির পক্ষে মর্মান্তিক।"

– কি রকম ?

–দেখো, একটা রাষ্ট্রের ভৌগলিক প্রসার, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য উন্নতি, জাতির দেহের সাথে সম্পর্কিত। এসবে জাতির দেহ শক্তিশালী হয়। কিন্তু প্রাণ হীন দেহ যেমন মূল্যহীন, সংস্কৃতিহীন জাতিও তেমনি সুকৃতিহীন। আসলে, সংস্কৃতিই জাতির প্রাণ। জাতির মান উন্নয়নে সংস্কৃতির দান অপরিসীম। তাই কি উন্নতি, কি উন্নয়নশীল– সকল জাতির জন্যেই একটা গতিশীল সংস্কৃতির বিশেষ প্রয়োজন। এটা কিন্তু একেবারে ধ্রুব সত্য কথা যে, সংস্কৃতি যাদের অনিশ্চিত বা দুর্বল, জাতির প্রতি আনুগত্যও তাদের দ্বন্দ্ববহুল, জাতির প্রতি মমত্ববোধও তাদের কাছে গুরুত্বহীন।

–কেন ?

– সংস্কৃতিই যে জাতি গঠনের সোপান সংস্কৃতির রাখি-বন্ধনেই যে সংঘবদ্ধ হয় মানুষ আর গড়ে উঠে জাতি। যেমন বার্ডস অব দি সেম ফেদার ফ্লক টুগেদার তেমনি একই ভাব ভাষার, একই আবেগ অনুভূতির, একই আচার অনুষ্ঠানের, একই রীতি–প্রথার, একই কৃষ্টি সংস্কারের মানুষ স্বাভাবিক কারণেই একত্রিত হয়, জোট বাঁধে, আর এই ভাবেই একটা জাতি গড়ে উঠে। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখবে, বিশ্বের সকল জাতিই কিন্তু নিজ নিজ সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পৃথক পৃথক সংস্কৃতি সম্বলিত কোন জাতিই কিন্তু কালক্রমে এক থাকেনি। আমাদের দিকেই তাকাও। মূলতঃ এই সংস্কৃতির গরমিলের জন্যেই তো আমাদের মিল হলোনা পাঞ্জাবীদের সাথে।

আব্দুল্লাহ এ কথার জবাবে শিশুর মতো বললো, "একটু ভুল হলো ওস্তাদ। সংস্কৃতির গড়মিল নয়, ভাষার গড়মিল।"

বললাম, "ঐ ভাষাটাও যে সংস্কৃতিরই অঙ্গ আব্দুল্লাহ। সংস্কৃতিতো একটা একক কিছু নয়, অনেক কিছুর সমষ্টি। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, নাটক, সঙ্গীত,

বইঘর.কম ও রোকন

চিত্রকলা, চারুকলা, নৃত্যশিল্প– অর্থাৎ মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর সকল প্রক্রিয়াই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। সংস্কৃতির লক্ষ্য–মানুষের উন্নতমানের মন মানসিকতা গড়ে তোলা। আর বলতে পারো, ঐ উন্নতমানের মন মানসিকতাটাই হলো সংস্কৃতি।"

আব্দুল্লাহ এবার অধৈর্য কণ্ঠে বললো, "ও মাই গড। আপনি কিন্তু ক্রমেই বেজায় এ্যবস্ট্রাক্ট এ চলে যাচ্ছেন ওস্তাদ। এই নগদা নগদির বাজারে ও সব এ্যবস্ট্রাক্ট আইডিয়া অচল।"

বললাম, "এই জন্যেইতো এ বাজারে মানুষের মূল্য সবচেয়ে কম আব্দুল্লাহ। মানুষ তো পশু নয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। এ্যবস্ট্রাক্ট চিন্তা ভাবনাটা মানুষের জন্যেই। ওটা এড়িয়ে যাওয়া– না মানুষ, না জাতি, কারো জন্যেই কল্যাণকর নয়।

– আপনার আসল কথাটি কি ওস্তাদ?

– আসল কথাটা হলো, একটা বলিষ্ঠ সংস্কৃতি একটা জাতিকে বিশ্বের বুকে, ইতিহাসের পায়ে যতখানি স্মরণীয়, বরণীয় এবং মহিমান্বিত করতে পারে বোধকরি তার শতাংশের একাংশও পারে না সেই জাতির সমুদয় সম্পদ আর শক্তি একত্রিত হয়ে।"

শুনেই লাফিয়ে উঠলো আব্দুল্লাহ। বললো, "সমুদয় সম্পদ আর শক্তি। মাফ করবেন, আর ইউ ইন সেন্স?

বললাম, "এবসোলিউটলী। আমি কোন কথার কথা বলছিনে, গায়ের জোরেও বলছিনে। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে। এক নয়, একাধিক।

– যথা?

– ইংরেজদের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর জয়যাত্রা তাদের রাজ্য সূর্যের অস্তাচল গমন ও ব্যাহত করেছিল, তাতো জানো। কিন্তু এত শক্তি এত বিত্ত সত্বেও স্বর্ণযুগের বিন্দু পরিমান গৌরব কি তারা অর্জন করতে পেরেছিল তাদের জাতির জন্যে? ষোড়শ শতাব্দীর এলিজাবেথ যুগ ইংরেজদের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সম্মানে সম্মানিত। এটা কি জন্যে হয়েছিল? ইংরেজদের সম্পদের জন্যে? দুর্দ্ধর্ষ্য স্পেনিস আর্মাডা ধবংস করার জন্যে? লরেন্স, হকিংস, ড্রেক– এদের লুটতরাজের জন্যে? নো, নেভার। সে যুগের ইংলন্ড স্বর্ণযুগের সম্মান পেয়েছে শেকসপীয়ার ও তার সমসাময়িক মনীষীগণের অবদানের জন্যে।

– ওস্তাদ।

– খালেদ বিন আল-ওয়ালিদ, আমর ইবনে আল আস, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহম্মদ বিন কাশিম, মুছাতারিখ এদের অতুলনীয় শৌর্য বীর্য গোল্ডেন এজের কিঞ্চিত সম্মানও কি আনতে পেরেছে ইসলামীক এমপায়ারের জন্য ? তারা সাম্রাজের সীমানাই শুধু বৃদ্ধি করেছে, সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করেছে ব্যস। এর অধিক সাধ্য তাদের ছিলনা। সে শিরোপা অর্জ্জন করেছে বাগদাদের খলিফা আল মামুনের যুগ। কোন বীর্য বা বিত্ত নয়, সে যুগে ইসলামিক সাম্রাজ্যে অবিস্মরণীয় জ্ঞান ভান্ডারের বিকাশই তার কারণ। ইসলামীক সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বের যত শ্রদ্ধা তা সব ঐ খানে, অন্য কোন খানে নয়। ভারত বর্ষে গুপ্ত যুগ স্মরণী বরনীয় যুগ। কিসের জন্যে ? সমুদ্র গুপ্তের বীরত্ব বা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের অর্থের জন্যে নয়। গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগে পরিণত করেছে- কালি দাস, বান ভট্ট, বরাহ, মিহির – প্রভিতি নব রত্নের অবদান। আব্দুল্লাহ, নজীর কি একটি দুটি ? নীরো, নেবুকাদনিজ্জার, হ্যানিবল, জুলিয়াস সিজার – কেউ ইতালীর জাতীয় জীবনে জাগরণ আনতে পারেনি। ইতালীর জাতিকে জীবন দিয়েছে ডাটে, বোকাকশিও, রাফেল টিটিয়ান, মাইক এ্যঞ্জেলো, লিও নার্দো ডা ভিন্সি। অতীত গ্রীসকে কে না শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে ? অতীত গ্রীসের ঐতিহ্য কার না জানা ? গ্রীস্‌কে এই অতুলনীয় সম্মানে সম্মানিত করে'কে" দারিউস্‌ ? আলেকজান্ডার ? নট এট অল। গ্রীসকে বিশ্বর বুকে মহিমান্বিত করেছে সক্রেটিস, প্লাটো, এরিস্টোটল, জেনোফেন, হোমার, হেরোডোটাস, ইউরিপিডাস, সোফাক্লীস এঁরা। উদাহরণ দিতে গেলে এর শেষ নেই। কাজেই, সে রেশ আর টানতে চাইনে।"

– আশ্চর্য। সংস্কৃতিকে নিয়ে আপনি এত গভীর চিন্তা করেন ওস্তাদ ?"

– না করে যে উপায় নেই। কোন স্বর্ণযুগের শিরোপার জন্যে নয়, নেহাতই বাঁচার জন্যেও আজ এই সংস্কৃতির চর্চা অর্থাৎ মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তির উন্মেষ ঘটানোর প্রক্রিয়া সচল রাখার প্রয়োজন আমি একান্তভাবে অনুভব করি। আজ আমাদের বড় অভাব অর্থের নয়, চরিত্রের– অর্থাৎ উন্নতমানের মন মানসিকতার। আমাদের নৈতিক চরিত্রের এত অবক্ষয়ের কারণ কি জানো ? মনে আমাদের ময়লা ধরে গেছে– মরচে পড়ে গেছে। মানুষের অরিজিন্যাল বা র‍্যাশানাল মনটা নির্জীব হয়ে গেছে। সম্পদ আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তনের প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে শুধু সম্পদ বৃদ্ধির পেছন ছোটা আর স্বর্ণযুগের পেছনে ছোটা একই কথা। শুধু আমাদের কথাই বা বলি কেন ? আজ গোটা বিশ্বের যা অবস্থা, তাতে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিজ্ঞানের চাকা সম্পদ বৃদ্ধির

বইঘর.কম ও রোকন

প্রয়াসে যত দ্রুত গতিতেই ঘুরুক না কেন, মানুষের মনের চোখ না ঘুরলে এ ভাবের ভরাডুবি বিজ্ঞানের বাবাও রোধ করতে পারবে না। আব্দুল্লাহ্ এবার বিপুল উচ্ছাসের সাথে বলে উঠলো,–রাইট ওস্তাদ, ইউ আর পারফেকটলী রাইট। কি আশ্চর্য এই দিকটাতো একদিনও ভেবে দেখিনি।

আব্দুল্লাহ্ এবার বিপুল উচ্ছ্বাসের সাথে বলে উঠলো,–"রাইট ওস্তাদ, ইউ আর পারফেক্‌টলী রাইট। কি আশ্চর্য্য! সংস্কৃতির এই দিকটাতো একদিনও ভেবে দেখিনি!"

আব্দুল্লাহ্ বিস্ফোরিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি তার অলক্ষ্যেই একটু খানি হাসলাম। পরে ধীরে ধীরে বললাম, "অবশ্য তা না ভেবে ভালই করেছো। অতটা না ভেবেই যদি তোমার এ হাল হয়, ভাবলে না জানি আর কি হতে পারতো।"

আমার এ ইঙ্গিত বুঝতে না পেরে আব্দুল্লাহ্ বললো, – "মানে।"

দূর থেকে সালেহা বললো, "ঢের হয়েছে। আর মানের দরকার নেই। দাদুকে নিয়ে শিগ্‌গির এসো। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

আব্দুল্লাহ্ বললো, এখন আর চা কেন ? একবারে খাবার দিলেই তো –

সালেহা বললো, আগে চা টা খেয়ে নাও। তোমরা এশার নামাজ পড়তে পড়তেই খাবার আমি রেডি করে ফেলবো।

# ছয়

পরের দিন আব্দুল্লাহর বাড়ী থেকে বিদায় নিতে গিয়ে আর একবার ভাল করে বুঝলাম– 'একে নাচনে বুড়ি, তাতে ফের নাতিনের বিয়ে'– পদার্থটা কি! এক আব্দুল্লাহর কারণেই রেহাই পাওয়া দায়, তার উপর আবার সালেহা! সহজে নিস্তার পাবো সাধ্য কি আমার। বাধ্য হয়ে আব্দুল্লাহর বৈঠক খানাতেই বাঁধতে হলো কয়ে কদিনের নীড়। কিন্তু নীড় বাঁধলেই তো হয় না, তাতে ফির সঙ্গিনী চাই। সঙ্গিনীহীন নীড় সেন্ট্রাল জেলের সেলের মতোই নীরস। নাতনীটাকে ডেকে এনে প্রমাণ সাইজ ফস্টি নষ্টি চলে খানিক– অধিক নয়। অধিক হলে শিষ্যের যষ্ঠি গুরুপৃষ্ঠের মর্যাদা ভুলতে বাধ্য। শূন্য ঘরে একা বসে একমাত্র লেখা কিংবা

বইঘর.কম ও রোকন

চন্দ্রদেখার উপাখ্যান খানিকক্ষণ দেখা বা পড়া ছাড়া করার কিছু থাকেনা। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও অবশ্য শূন্য ঘরই দরকার। তেমন ইচ্ছে আপাততঃ ছিল না। লেখা বা পড়ার মতো তেমন কোন উপাদানও ছিলনা হাতের কাছে। মানসিকতাও ছিলনা তদানুকূলে। বিগত তিন মাসে ছত্রও লেখা হয়নি পরবর্তী উপন্যাসের। নাটকে তো আর হাতই দেইনি দীর্ঘদিন।

বদ্ধঘরে কিছুক্ষণ অস্থির হয়ে পায়চারী করার পর বেরিয়ে এলাম নদীর ধারে। আনমনে তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এলাম এক আমবনে। ছায়াশীতল নদী তীর। উত্তপ্ত মধ্যাহ্নের পড়ন্ত বেলা। নদীবুকে মাঝি মাল্লার উদাত্ত কণ্ঠ। নদীঘাটে ললনাদের অকুণ্ঠ জলকেলী। অদূরে স্কুল ফেরত কচিকাঁচার মুক্তপ্রাণের কলরব। নাই শুধু বিহগের কুজন। অবশ্য বসন্ত বিগত বলে নয়, বন্দুক এখন ঘরে ঘরে। যা-ই হোক, পরিবেশটি মনোরম মনে হওয়ায় পথ থেকে নেমে এসে বসে পড়লাম নদীকূলে।

রং বেরঙ্গের পাল তোলা তরণীর আবির্ভাব ও তিরোভাব চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় কানে এলো এক ভাটিয়ালী সুর। দূর থেকে ভেসে আসছে গানঃ "সাগর কুলের নাইয়ারে অপোর বেলায়--------।" পরিচিত পল্লী গীতি। পথে ঘাটে কানে পড়ে হর হামেশাই। কোনদিন কান দেইনি তেমন। আজ এই নিঃসঙ্গ নদীকূলে মঝি কণ্ঠের সুমিষ্ট বিলাপটি আকৃষ্ট করলো আমাকে। একান্তে কান পেতে প্রাণপণ চেষ্টা করলাম গানটি হৃদয়ঙ্গম করার। কিন্তু পারলাম না। বৈঠা দাঁড়ের বৈরীসুলভ শব্দে, দাড়ি মাল্লার দুস্তর কোলাহলে, আর কেলীমগ্না রমণীকূলের দুর্বিনীত কাকলীতে সে সুরের অর্ধেকটা কানে এসে পৌঁছে তো আর অর্ধেকটাই আটকে যায় মাঝ পথে। তবু অখন্ড মনোযাগে পেতে রইলাম কান। কাকশঃ পরিবেদনা। স্কুল ফেরত কয়েকটি বালিকার এক আকস্মিক কোরাসে নিঃশেষে সম্পন্ন হলো ভাটিয়ালীর ভরাডুবি। কোরাসটি করুণতর। কণ্ঠস্বর কংশপাত্রের আর্তনাদ হুংকার। "রূপে আমার আগুন জ্বলে, যৌবন ভরা অঙ্গে------।" চেয়ে দেখি, যৌবন এসে মা জননীদের ধন্য করতে বিলম্ব আছে ঢের, রূপের বালাই নেই একজনেরও। তবু সেই অনাগত যৌবনের সম্ভাব্য আগুন ইতিমধ্যেই তড়পানি সৃষ্টি করেছে জননীদের। কুৎসিত নৃত্যের ভঙ্গিতে স্কুল ফেরত বালিকাবৃন্দের এই বৃন্দাবনী লীলা দেখে ওদের রূপের আগুন ছিটকে এসে লাগলো আমার মাথায়। মনে হলো খবরের কাগজে দেখা এক কার্টুনের কথা। এই গানের উপর ফায়্যার বিগ্রেডের তৎপরতার কার্টুন। কৌতুকবোধ করলেও মশা মারতে কামান দাগার মতোই মনে হয়েছিল কার্টুনটাকে। আজ এই মুহূর্তে আমার মনে হলো,. ফায়্যার বিগ্রেড কোন কথা, ভাগীরথের শক্তি থাকলে স্বয়ং

বইঘর.কম ও রোকন

গঙ্গাদেবীকে আজ আমি অবতরণ করাতাম এই আমবাগানে। দেখতাম, এই অনাগত যৌবনা জননীদের রূপের আগুন জাহ্নবীর জলপ্রপাতেও নিবৃত্ত হয় কিনা। গান ভাল, নাচও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সেখানে পাত্র পাত্রীর ভেদাভেদ আর রুচির প্রশ্ন আছে। প্রসাধনে রমণীর রূপ বৃদ্ধি হয়। তার সলজ্জ আচরণও আকর্ষণের। কিন্তু হিজরার (নপুংষের) প্রসাধনে কি বৃদ্ধি হয় ? তার 'সখি-আমায় ধরো-ধরো' ভাব দেখলে কেমন লাগে ? জবাই করা মুরগীর ছটফটানী দিয়ে নৃত্যকলার কোন অধ্যায় পরিবেশিত হয় ?

"বাবাজি, আগুন আছে ?" www.boighar.com

–সামনে এসে দাঁড়ালো এক গোবেচারী পথচারী। হাতে তার বিড়ি। বিগড়ে গেল মেজাজ। পকেটে হাত দিয়ে ম্যাচ বের করতে করতে ভাবলাম, একবার বলি' অত আগুন সামনে থাকতে আমার কাছে এসেছো কেন বাপু ? বিড়িটা ওদের দিকে ধরলেই তো চুকে যায় ল্যাঠা! আগুনের আর অভাব আছে কিছু ? ঘরে ঘরে প্রতিদিন এই ভাবে বুকের আগুন বৃদ্ধি পেলে বিড়িতো বিড়ি, ইটের ভাটা পোড়ানোর সমস্যা ও আর আমাদের থাকবে না দেখে নিও। ওদের কয়েকটাকে নিয়ে গিয়ে ভাটার পাশে বসিয়ে দিলেই ব্যস।'

আগুন নিয়ে বিদেয় হলো পথচারী। গায়িকাদের ডাক দিয়ে ছোট একটা ধমক দিতেই আগুন লাগলো বারুদে। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ-ধাবন করলো তারা এবং আমাকে জব্দ কারার মহতি উদ্দেশ্যে কণ্ঠের ভলিউম আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে ফের ধরলো সেই গান। নাচতে নাচতে যেতে লাগলো ভুতে ধরা রোগিণীর ভঙ্গিতে। তাদের সাথে যোগ দিলো কিছু চপল মতি ছেলেরাও। তারাও গেয়ে উঠলো, "শোন ললিতা শোন, আমার সাথে প্রেম করেছে তোর ছোট বোন"–ছোট বোনের প্রেমের কথা স্বয়ং প্রণয়ীই বড় বোনকে গেয়ে গেয়ে শোনানোর ব্যপারই বটে! এটা এযুগেই সম্ভব। কয়েকযুগ আগেও এমন গান কানে গেলে ক্ষোভে দুঃখে হার্টফেল করতো মানুষ। ভাবি, এই সব গান রচয়িতা আর পরিবেশনকারীরা কি মাতা-পিতা ভ্রাতা-ভগ্নি আর পুত্র-কন্যা বিবর্জ্জিত বনারণ্যের মানুষ ? এরা কি বেচে খেয়েছে দেহমনের সব কিছুই ?

ছেলে মেয়েদের এই অপরূপ রঙ্গ দেখে পুলকিত হয়ে উঠলো ঘাটে আসা রমণীকুল। আশেপাশের রমণীকান্তরাও। তাদের বিগলিত হাস্যোচ্ছাসের সমর্থনে বালক বালিকাদের বাঁদরামী সপ্তমার্গ ভেদ করে বোধকরি পৌঁছে গেল আল্লাহর আরশের কাছাকাছি। পল্লীরই এই অবস্থা, শহরের তো কথাই নেই। অথচ দেশ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার এরাই! একথা ভাবতেও যে নিজের কর্ণ নিজেই ধরে

বইঘর.কম ও রোকন

নিজের গালে ঠাশ করে চড় মারার ইচ্ছে হয় নিজেরই।

"নামটা কি, কও দেখি ?"

–সামনে এসে দাঁড়ালো এক অদ্ভুত গোঁফওয়ালা। হাতে লাঠি, মাজায় গামছা, মেজাজ গরম। লক্ষ্য করে দেখি, গোঁফই তার সম্পদ, সে নিজে সম্পদ গোরস্তানের। মেদ মাংস বিবর্জিত একটা আস্তহাড়ের ফ্রেম। লম্বায় হাত চারেক। হাত-পা কাঠির মতো। রক্ষে যে, এটা দিবাভাগের আম্রবন। সন্ধ্যাকালের শেওড়াতলা হলে বিপদ হতো।

তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বললাম- "নাম।"

–হ্যাঁ নাম। সেটা কি, কও দেকিন চটপট।

নামটা বললাম। শুনে সে বললো, "ব্যস, এবার এসো দেকিন আমার সাথে!"

–তোমার সাথে।

–হ্যাঁ, এই পাশের বাড়ীতে তলব আছে।

–তলব! কিসের তলব ?

–গেলেই বুঝবে। এসো–

–আহ হা, ব্যাপারটা কি তা বলোই না ?

–কি বলবো ? মেয়েরা ঘাটে আসছে আর তুমি ঘাটের পাশে বসে আছো।

ব্যাস! আর কি চাই ?

এর বেশী আর লাগেও না। আমতলা কদমতলা নয়। ঘাটানুগামিণীরা গোপিণী নয়। আমি বৃন্দাবনের কানাইও নই। ধরে বসলে এটুকু সামাল দেয়াই দুঃসাধ্য। বুঝলাম ছগিরা হলেও গুনাহটা গুরুতর। কপালে দুঃখ আছে।

কেটে পড়া কাপুরুষতা। নিরাপদও নয়। তাই বীরোচিত মুড নিয়ে উঠে দাড়ালাম বিক্রমে। কতজনে কত কি করে তাতে কিছু হয় না, আমি আর কি করেছি এমন ? মনে পড়লো এক টম টমওয়ালার কথা। কানা ঘোড়া দিয়ে গাড়ী চালানোর দায়ে তাকে উঠতে হয় আসামীর কাঠগড়ায়। অভিযোগ গঠন করে হাকিম তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কানা ঘোড়া দিয়ে গাড়ী চালিয়ে অপরাধ করেছো। অপরাধ স্বীকার করো ?" টম টমওয়ালা রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জের লোক। সে খাশ নবাবগঞ্জী ভাষায় উত্তর দেয়, "অপরাধ! কি কহিছেনজি ? কুমদিনীকানা একটা কলেজ চালাইছে আর আমি কানা ঘোড়া দিয়া গাহড়ী

বইঘর.কম ও রোকন

চালাইছি। তো কি করেছি হুজুর ? মানুষতো খুন করিনি ?' শুনে একটু মুচকি হাসলেন হাকিম। শেষ পর্যন্ত খালাস দিলেন তাকে। না দিয়েই বা তিনি করেন কি! এমন কথার পর আর করার কি থাকে। আমারও এ একই ব্যাপার। রীতিমতো খেয়াল করেই চন্ডিদাস বড়শি ফেলে বসে থাকে ঘাটের পাশে, আর আমি একটুখানি বসেছিলাম বেখেয়ালে। তো এমন কি করেছি ? কারো বসনতো চুরি করিনি।

হাজির হলাম তলবকারীর গৃহে। গৃহটি সাদামাটা নয়। পুরাতন হলেও একটা ছোট-খাটো প্রাসাদ। পল্লীতে এমনটি নতুন নয়। এগুলো জমিদারী প্রথার বাইপ্রোডাক্ট। যে বসার ঘরে বসলাম, তা গ্রাম গঞ্জের বৈঠকখানা নয়, একটা আপ-টু-ডেট ড্রয়িংরুম। সম্ভাব্য সর্ববিধ উপকরণে সুসজ্জিত, বুঝলাম, আমার উপর আক্রোশ যার তিনি একজন এ্যারিষ্টোক্রাট। চিন্তার বিষয়। বর্বরের রাগের কোন আলাদা রূপ নেই। সে রাগের প্রকাশ প্রত্যক্ষ, প্রতিক্রিয়া দ্রুত, পরিসমাপ্তি তাৎক্ষণিক। কিন্তু অভিজাতদের বেলায় তা অন্যরকম। এখানে রাগের একসপ্রেশান– আনসিন, এ্যাকশান–স্লো, এফেকট–পেনেট্রেটিং। আরো মারাত্মক যে, সে রাগের পরিসমাপ্তি কোথায়–তা কিছুই বোঝার উপায় নেই। আমার নিজেকে নিয়ে বড় একটা ভাবনা মনে এলোনা। কারণ আমি মুসাফির। আজ না হোক, চলে যাবো দু'দিন পরই। ভাবনা হলো, এর জের শেষ পর্য্যন্ত আব্দুল্লাহকে টানতে না হয় দীর্ঘদিন।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইলাম চোখ মুজে। প্রতিপক্ষের আক্রমণের প্রতিক্ষায় কাটতে লাগলো সময়। কতক্ষণ কেটে গেলো খেয়াল নেই। হঠাৎ কানে এলো –"চা-।"

চমকে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখেই চমকে উঠলাম আবার। দাঁতের তলে ঠোঁট ফেলে উদ্বেলিত হাঁসির বেগ প্রাণ পণে দমন করছে হেনা। হাতে তার চায়ের সাথে খাবার।

এই বিশ্বের সাথে লেনা-দেনা আমার প্রাণ কাবার তখন।

সশব্দে হেসে ফেললো হেনা। খাবার ট্রে টেবিলে রেখে হাসতে হাসতে বললো, কেমন চমকিয়ে দিয়েছি বলুন তো ?

আমি বলবো কি। যে টুকু সম্বিত টিকে ছিলো, তারই জোরে আমিতো তখন নিজের গায়ে অবিরাম চিমটি কাটায় ব্যস্ত! নিছক স্বপ্ন ছাড়া সত্য বলে ধরা যায় একে ? ভৌতিককান্ড বোধে এতক্ষণও যে হার্টটা জবাব দেয়নি এইতো ঢের। ব্যাটা গোফওয়ালার পা-দুটো মাটি স্পর্শ করেছিলো কিনা, দেখা হয়নি লক্ষ্য

বইঘর.কম ও রোকন

করে। হেনা কাল গেল বিয়ের সাথে, আজ সে এখানে! রিয়ালিটি ফিকশানের চেয়েও ফিকটিশাস হয় বলে এতখানিই হয় ?

আমার ভাব দেখে হেনা আবার খিল খিল করে হেসে উঠে বললো, কি ব্যাপার। এই বীরপুরুষ আপনি ?

"কোনমতে বললাম, "না, মানে-"

হয়েছে – হয়েছে- বলে পাশে বসলো হেনা। আহার-আদি এগিয়ে দিয়ে সে মোচন করলো সন্দেহ। এইটেই তার খালার বাড়ি। আর অধিক অসুস্থ বোধ করায় বিয়ের সাথে যায়নি তার খালা। ঐ বাজারেই নেমে পড়ে গতকালই ফিরে এসেছেন বাড়ীতে। বিয়ে ফেলে হেনাও স্বেচ্ছায় এসেছে তার খালার সাথে। তার এই ইচ্ছের মধ্যে আর কিছু আছে কিনা- সেটা জানে সে আর সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং। আজ ঐ বাচ্চাদের হৈ হুল্লোরে ঘাটের দিকে বেরিয়ে আসে হেনা। আমাকে লক্ষ্য করেই প্রায় নিঃসন্দেহ হয় সে। বাড়ী ফিরেই পাঠিয়ে দেয় ঐ গোঁফওয়ালাকে। গোঁফওয়ালার কাজ ছিল- নামটা মিলে গেলেই আমাকে ডেকে এনে বসানো। একটু ছিট আছে ওর মাথায়। সে যা করেছে তা সবটুকুই ওভার এ্যাকটিং।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, "সে ব্যক্তি যে আমিই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন কি করে ?"

জবাবে হেনা বললো, "ও আমি দেখেই বুঝেছি। ওটা কি একটা পার্ক, না বসার জায়গা! আপনার মতো সৃষ্টি ছাড়া না হলে, ঐখানে অমন ভাবে বসে থাকবে কে ?'

–আচ্ছা!

– সেইজন্যেই তো লোক পাঠিয়ে দিয়ে চড়িয়ে দিয়েছি চা। এই অবেলায় এক কাপ চা ছাড়া আর কি দিয়ে আপ্পায়ন করি বলুন ?

– কিন্তু এমনতো হতে পারতো, চা এনে দেখলেন- আমি নই, অন্য মানুষ!

– তাই বুঝি ? বাড়ীতে উঠতেই আমি দেখে নিয়েছি আগে। কিন্তু ধন্য মানুষ আপনি!

– কেন ?

– এইভাবে পথে প্রান্তেই কাটিয়ে দিলেন জীবন?

– মানে ?

– ভুত ভবিষ্যৎ নিয়ে যে একবিন্দু ভাবনা নেই, ওটা আপনার স্বভাব দেখেই বুঝেছি। ঘরদোরও কি বেচে খেয়েছেন সাকুল্যে ?

বইঘর.কম ও রোকন

– আপনার এ ধারণার হেতু ?

– নইলে ঘরের টানতো থাকতো কিছু। ঘরমুখো বাঙ্গালী, এটাতো সবার জন্যেই প্রযোজ্য!

– শুধু ঘরই তো মানুষকে টানতে পারে না ভদ্রে, আরও কিছু চাই। ঘর বাহির যার সমান, তার যেখানে রাত, সেখানে কাত।

হকচকিয়ে গিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে রইলো হেনা। পরে আবার হেসে উঠে বললো, "ও তাই বলুন, দায়দায়িত্বহীন একেবারেই বৈরাগ্য ?"

বললাম, "শ্রী শ্রী বটকেশ্বর বৈরাগ্য।"

এক সাথে হেসে উঠলাম উভয়েই।

গল্পে, গুজবে, আলাপে, ঠাট্টায় হেনার সাথে কেটে গেল বেলাটা। পরের দিন আসবো বলে কথা দিয়ে পথে যখন নামলাম, তখন দেখি, তাল মিলেনা ধাপে। বুঝলাম, আমি এখন মজনু। বোধকরি তারও অধিক দিওয়ানা!

# সাত

হেনার ওখানে যাওয়া হয়নি পরের দিন। আব্দুল্লাহর দায়ে পরে গেলাম এক গঞ্জে, ফিরে এলাম সন্ধ্যে বেলা। ফিরে দেখি, একদম টুয়েলভ ও ক্লক। অর্থাৎ আমার একেবারেই বারোটা বেজে গেছে। আমার খোঁজে এসেছিলেন হেনা বেগম নিজেই। তিনি কাটিয়ে গেছেন প্রহর, সালেহার সাথে পাতিয়ে গেছেন পিরীত, সাফা করে রেখে গেছেন আমার ইহকাল ও পরকাল। ঘরে ফিরতেই ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সালেহা। তার চটুল রসিকতা আর ট্যাক্স-ফ্রি টিপ্পনীর ঠ্যালায় শেষ পর্যন্ত অবস্থা হলো– 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'। পরের খবর আরো করুণ। হেনা আমার বায়োডাটার খোঁজ নিয়েছে খুঁটে খুঁটে– বিষয়, বিত্তম শিক্ষা, স্বভাব– সব কিছুরই। খোঁজ দিয়েছেন সালেহা খাতুন স্বয়ং। শ্রীমতি খাতুন অতি খুশির সাথে জানালেন, সত্যি খবর দিলেও তিনি আমাকে সার্টিফাই করেছেন শক্ত করে। তার অর্থ আমাকে পথে বসিয়েছেন পোক্ত করে। একজনের কানা-কুৎসিৎ পরিচয় দিয়ে পরে দেখতে সে সুন্দর বলা, তার কদর্যতাই আর অধিক ফুটিয়ে তোলা। সালেহা যে সত্যি খবর জানে আমার তা সত্যি নয় এক রত্তি। সত্যি বলার মানুষ নয় জনাব আলী ওরফে 'জনা'–মিয়ারা। আমার সেই

বইঘর.কম ও রোকন

রেলওয়ে প্লাটফরমের শুভাকাঙ্খী জনা মিয়া আরো জনা কয়েক শকুনি-সখা সাথে নিয়ে এ অঞ্চলে এসেছিলেন কোন এক কাজে। কাজের ফাঁকে বাড়তি সময়টুকু বাজে খরচ না করে নিষ্ঠার সাথে ওটাকে তারা লাগিয়ে গেছেন অকাজে– অর্থাৎ সালেহাকে দিয়ে গেছেন আমার এক অবাস্তব ইতিবৃত্ত। তাদের ভাষায়– বাপের বিষয়বিত্ত– অর্থ কড়ির সব কিছুই আসক্তি চরিতার্থে উড়িয়ে দিয়েছি আকাশে। মদ-গাজা-ভাঙ খেয়ে ফুঁকে দিয়েছি সব। আমি এখন কিং অবদি ফুটপাত, লেখাপড়ায় ব-কলম, চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণ। আয়ান ঘোষের লাঠির ঘায়ে পিঠে আমার চামড়া গেছে কয়েক পরত।

এই হলো সালেহার সাকুল্যে জানা খবর। ইচ্ছে করেই গত পরশু শুনার পর সালেহার এই ভুলটা আমি ভেঙ্গে দেইনি তখন। কারণটা অন্য কিছু নয়। আমি তো আমিই আছি। আমার সম্পদের হের ফেরে যদি সালেহাদের কাছেও হের ফের ঘটে আমার খাতিরের, তবে আর তাদের খাতিরে প্রয়োজন নেই আমার।

গোল বেঁধেছে এখানেই। সালেহা আমার কোলেপিঠে মানুষ করা মানুষ বলে, আর আব্দুল্লাহর আমি পরম প্রিয় গুরু বলে, তাদের কাছে আমার কদর যত অধিকই হোক না কেন, আমার এই পরিচয়ে অন্যের প্রাণে প্রেমের বন্যা ছুটবে, এমনটি আশা বাতুলতা। এরপর বড়জোর হেনা আমাকে করুণা করতে পারে খানিক, কামনা করার যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। প্রেম যত উদারই হোক, বয়ে যাওয়া পথের মানুষের দ্বারে ওটা পা ফেলে কদাচিত। অতএব, অশ্বত্থামা হত, ইতি-গজঃ। তার আহরিত ধারণা পাল্টে দিয়ে নিজেকে জাহির করতে যাওয়া আমার রুচি বিরুদ্ধ। শক্ত কাজও বটে। কারণ "অশ্বত্থাম হ" এর এ্যাকশান আলাদা। ওটা একবার কানে যাওয়ার পর, "মানুষ নয়, হাতি-এটুকু কানে দেয়া দুষ্কর।

www.boighar.com

ভারাক্রান্ত মন দিয়ে এক যাত্রাপালায় চলে এলাম রাত্রিকালে। পথ দূরের রথ চরণ, সাথী আব্দুল্লাহ সারথী অশান্তিকে চাপা দেয়ার আগ্রহ। সৌখিন দলের অনুষ্ঠান। পরিচালক আব্দুল্লাহ। স্থান এক বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গন। উদ্যোক্তা বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ। অর্থাভাবে কর্তৃপক্ষের এই অগত্যা মধুসুদন। অবশ্য, শ্রী মধুসুদনের হস্তক্ষেপ ছাড়া মধু আহরণের এই পদক্ষেপ প্রায়শঃই আক্ষেপের কারণ হয় বারো ভুতের অত্যাচারে। কিন্তু মরা কাকের চড়কে আর ভয়কি! সত্যিকারের বিদ্যোৎসাহী যাঁরা, তাদের সইতে হয় অনেক গ্লানী, করতে হয় অনেক কিছু। প্রতিষ্ঠান খাড়া হয়ে গেলে তাদের যেতে হয় ভাগাড়ে, আগাগোড়া বিরোধীতা করে যারা, তারা পায় কর্তৃত্ব। এ বঞ্চনা স্বীকার করেই এই বিদ্যোৎসাহী

বইঘর.কম ও রোকন

ব্যক্তিরা বয়ে বেড়ায় জিল্লতি। বিদ্যালয়কে বাঁচাতে বস্তাঘাড়ে গৃহস্থের দ্বারস্থ হওয়াটা ও যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, সেখানে পাঁচজনের ফুর্ত্তিফাত্তার ফাঁকে যদি পাঁচটা পয়সা বিদ্যালয়ের আসে তো মন্দ কি। অর্থ শিক্ষা বিস্তার সমাচার পল্টন ময়দানে একরকম, বাস্তবে অন্যরকম। থাক সে কথা। অনুষ্ঠানটিও আবার একমাত্র কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেতেই হতো না, যদি গডেজ অব আর্ট' এর কিছু অন্ধ ভক্তেরা উল্লাসিত হয়ে এক পায়ে না দাঁড়াতো এক কথায়। বস্তুতঃ, অনুষ্ঠানের মূল রচনা এদেরই। এদের লক্ষ্য আর্ট, কর্তৃপক্ষের অর্থ। আর্টের খাতিরে আটঘাট বেঁধেই তৈরী হয়েছে এরা। এরা চাঁদা তুলে ভাড়া করেছে সাজ পোষাক এবং নামকরা দল থেকে বেছে এনেছে ফিমেল আর্টিস্ট। গিয়ে দেখি, আয়োজন আর এ্যাডভারটাইজমেন্ট মনোগ্রাহী হওয়ায়, গুণগ্রাহী ছাড়াও অসংখ্য সাধারণ দর্শকে প্যান্ডেল ভর্ত্তি। টিকিটের রেট কিছু চড়তি হওয়া সত্বেও কমতি হয়নি ভীড়ে।

শুরু হলো বই। শুরু থেকেই শুরু হলো অনবদ্য অভিনয়। সৌখিন দলের এমন প্রাঞ্জল অভিনয় চোখে পড়ে কদাচিত। অনেক প্রফেশনাল টিমেও এমনটি বিরল। বুঝলাম ডাইরেকশানেও হাত পাকিয়েছে আব্দুল্লাহ্। নায়িকাটিও চিত্তাকর্ষক। সে রূপসী এবং চৌকষ শিল্পী। এক পর্দানশীন রুচিশীলা শাহজাদির যে চরিত্রে রূপদান করছে সে তা প্রশংসার। বিনম্র ও মধুর। দৃশ্যের পর এগিয়ে চলেছে দৃশ্য। তন্ময় হয়ে উপভোগ করছি এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ক্লাইমেক্সে উঠে গেছে নাটক। নিদারুণ মর্মব্যাথায় বিক্ষত শাহজাদি এক অভাবনীয় অন্তর্দ্বন্দের সম্মুখীন। 'টু বি অর নট টু বি' অবস্থা।

অকস্মাৎ প্রলয়।

প্রচণ্ড কোলাহলে বধির হলো কর্ণ কুহর। দ্বিধাহলো ধরিত্রী। দেখি শুরু হয়েছে তান্ডব নৃত্য। প্যান্ডেলের বাইরে সুচীভেদ্য অন্ধকার, ভেতরে খন্দকের যুদ্ধ। দৈত্যবৎ চীৎকার করছে আসর ভর্তি লোক, হাত পা ছুড়ছে রণংদেহী ভঙ্গিতে। কারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করতেই কানে এলো– অভিনয় নয়। ভাবলাম, তার জন্যে অসুরের মতো এত লম্ফঝম্ফ কেন! সুর করেই তো বলা যায়, নায়িকার এই অভিনয়–"অভিনয় নয় গো, অভিনয় নয়। এই হাসি এই ----" কিন্তু ও মাই গড!" কারণ ওটা নয়। নাচ চাই।

দেখি, আসন ত্যাগ করে কিছু দন্ডায়মান দর্শক তখন বসন ত্যাগ করার অবস্থায় উপনীত। তারা দ্বিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সমস্বরে হল্লা করে বলছে–"বাদ দেও ওসব। পয়সা দিয়ে ঐ প্যান প্যানানী শুনতে আমরা আসিনি। নাচ লাগাও

বইঘর.কম ও রোকন

নাচ। নইলে ফেরত দাও পয়সা।" বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, এই মনোভাব শুধু তৃতীয় শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ নয়,. দ্বিতীয়,. প্রথম এবং স্পেশাল সর্বত্রই এর বিস্তৃতি। সবাই চায় নাচ।

কর্তৃপক্ষ কাতর কণ্ঠে জানালেন, এ্যামেচার দল এটা, প্রফেশনাল নয়। নর্তকী পাওয়া যাবে কোথায়। ভূমিকার প্রয়োজনে গুণাগাথা ফিমেল আর্টিস্ট। নাচ দেবে কে ? কে একজন বলে উঠলো, "নায়িকা দেবে নাচ। আমরা নায়িকার নাচ দেখতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন–

–ইয়েস – ইয়েস – ইয়েস।

সাধারণ সমর্থন নয়, একেবারে মিরাকুলাস। ওভারহেলমিং মেজরিটি বলে একটা শব্দ আছে। শব্দরূপ অনেক পড়েছি। এটার বাস্তব রূপ বড় একটা দেখিনি। আজ দেখলাম। মুষ্টিমেয় গুটিকয় সুধীজন বাদে, সিংহনাদে সকলের চীৎকার ইয়েস ইয়েস-ইয়েস-ইয়েস। এমন স্বতঃস্ফুর্ত প্রচণ্ড সমর্থন এই পৃথিবীতে অন্য কোন প্রস্তাব অদ্যাবদি লাভ করেছে বলে জানা নেই আমার। পড়িওনি কোথাও। না ইতিহাসে না মাইথোলোজীতে। আরো নিদারুণ পরিতাপের বিষয় যে, সোফা সেটের কয়েকজন তথা কথিত ভদ্রলোকও নির্লজ্জ ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে এই প্রস্তাবকে শুধু সমর্থনই করলো না, তাদের উল্লাস দেখে মনে হলো–এমনটির বিনিময়ে তারা, 'লেটরোম বি ইন টাইবার মেল্ট।' বলে পারলে গোটা রোমটাই বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। সমরখন্দ বিকিয়ে দিতেও একপায়ে খাড়া!

মারা পড়লো নাটক। নাচের জন্য বিপন্ন হলো–প্যান্ডেলের চেয়ার বেঞ্চ-পুত্তর প্রতিষ্ঠানের কষ্টার্জিত প্রোপার্টি। একজন শুরু করলেই ছাতু হবে সবগুলো। দিশাহারা কর্তপক্ষ শরণ নিলো নায়িকার। এখন চরণ ধারণ করণীয় হলেও আর সময় নাই দ্বিরুক্তির। অবশ্য, দরকার হলোনা অতটার অল্পতেই এগিয়ে এলো নায়িকা। পেশাদার দলের মেয়ে–সর্ববিদ্যায় পারদর্শিনি। পরিস্থিতি আঁচ করে সে উঠে দাঁড়ালো তৎক্ষণাৎ। খানিক পরেই নাটকের সেই সতি সাধবী কুমারী, মিনি স্কার্ট পরে, ফেল্টহ্যাট মাথায় দিয়ে ব্রা দিয়ে বুক বেধে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় এসে যখন নাচের তালে গান ধরলোঃ "ও–ডার্লিং-ডার্লিং ডার্লিং-" তখন প্যান্ডেলটাকে মনে হলো পিকাডেলী সার্কাস, মঞ্চটাকে মনে হলো ইউরোপ বাই নাইট, মেয়েটাকে মনে হলো পেশাদার পসারিণী, দর্শকদের মনে হলো লালায়িত লম্পট।

উন্মত্ত আনন্দে দুলতে লাগলো দর্শকেরা। বিচ্ছুরিত হতে লাগলো অশ্রাব্য! কমেন্ট। উত্থিত হতে লাগলো আবেগের প্রস্রবন। আমার পাশে বসা এক

বইঘর.কম ও রোকন

মান্যবরও মন্তব্য করলেন, "ওহ। পয়সাটা ওয়াশিল হলো এতক্ষণে।" লজ্জায় মুখ লুকানোর ঠাঁই না পেয়ে তৎক্ষনাৎ ত্যাগ করলাম প্যান্ডেল।

নির্জ্জন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক কাঠি সিগারেট জ্বালালাম। মাথার উপর অনন্ত আকাশ, মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তার অনল। আর কত দূরে মোরে নিয়ে যাবে হে বিকৃতি ?

লোকে বলে, অনুকরণে সর্বাধিক আগ্রহী বানর–বিশেষ করে মন্দ কিছু। তারপরই নাকি বঙ্গবাসি। দুনিয়াতে এত মানুষ থাকতে আমরা কেন ঐ নীচ প্রাণীর আচরণে আকৃষ্ট হলাম, তা মাথায় আমার ঢোকেনা। তবে এটা বুঝতে পারি যে, বানরের কাজ মানুষ করলে তা থেকে মহৎ কিছু আশা করা যায় না। অনুকরণ সব সময়ই খারাপ নয়। কিন্তু নির্বোধের অন্ধ অনুকরণ অনেক সময়ই মারাত্মক। একারণেই বোধ করি ইউরোপীয়ানদের অনুকরণ করতে গিয়ে, আমরা তাদের ডাস্টবিনটাই স্বদেশে টেনে আনছি সাগ্রহে, ট্রেজারটা নয়। তাদের যা কিছু ঘৃণ্য, যা কিছু নিকৃষ্ট, বহ্নিমুগ্ধ পতঙ্গবত আমরা সেই দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছি দুর্ণিবার আবেগে, তাদের উৎকৃষ্ট সব কিছু সযতনে পরিহার করে। এটা একটা আত্মঘাতী প্রক্রিয়া বইকি। অথচ এই তিন চার দশক পূর্বেও এদেশে রুচির এমন অধঃপতন পরিলক্ষিত হয়নি তখন মানুষের মন পরিষ্কার, উপলব্ধি ছিল পবিত্র। উৎশৃঙ্খল ও তাৎক্ষণিক তৃপ্তির-পরিবর্তে মানুষের উপভোগের জের ছিল দীর্ঘস্থায়ী, বিষয় ছিল পৃথক।

মনে পড়ে বাল্যকালের কথা। এমনি একটা যাত্রাপালার ঘটনা। একদিকে হাস্যোদ্দীপক, অন্যদিকে হৃদয় গ্রাহী। দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে যাত্রাপালা। বারোয়ারী উৎসব। উৎসবটা জমকালো করার জন্যে গায়ের দল বাদ দিয়ে একটা নামকরা ভাল দল দূরবর্তী গাঁ থেকে ডেকে এনেছে কর্তৃপক্ষ। তখনকার গ্রামগঞ্জে এটা একটা গরম খবর।

সূর্যাস্তের সাথে সাথে নাট্যাঙ্গণ সরগরম। গিয়ে দেখি, যাত্রা পার্টির পৌছানোই শেষ হয়নি তখনও। এক একজন এসে পড়ছে এক এক সময়। বৃদ্ধি হলো রাত। বৃদ্ধি পেলো শ্রোতাদের পরিমাণ ও চাপ। ফলে, শুরু হলো অভিনয়। পালার নাম 'চাষার ছেলে' পালার নায়ক দেবরায়, নায়িকা দামিনী। বিজয়নগরের কাহিনী নিয়ে লেখা বই। শুরুতেই মার মার কাট কাট অবস্থা। একনায়কের আত্মত্যাগ, পৃথ্বিনায়কের প্রভূভক্তি, রঙ্গরায়ের চক্রান্ত দেবরায়ের প্রতি রাজকুমারী দামিনীর দুর্নিবার প্রেমাসক্তির বদৌলতে প্যান্ডেলে পিন-ড্রপ সাইলেন্স।

"তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি...' অবস্থায় রাজকন্যা দামিনী অনেকক্ষণ রয়ে গেল লোক-চক্ষুর অন্তরালে। নাট্যকারের নিষ্ঠুরতায় মঞ্চে তার

বইঘর.কম ও রোকন

প্রবেশ ছিল অনেকখানি বিলম্বে। কিন্তু আর তর সয়না দর্শকের। রাজকন্যার অসামান্য রূপগুণ আর দেবরায়ের প্রতি তার দেয়াল ভাঙ্গা আসক্তির কাহিনী ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে দর্শকের কানে। দেবরায়ের প্রাণে তা রস সঞ্চার করুক আর না করুক, দর্শকের প্রাণ তখন প্রেমরসে টইটুম্বুর! দেবরায়ের আকাঙ্খা থাকুক আর না থাকুক, নায়িকাকে তার পাশে পাওয়ার জন্যে দর্শকেরা উদগ্রীব। পরের মুখে ঝাল খাওয়ার নজীর আছে অনেক। পরের মারফত প্রেম করার নজীর এই একটিই।

অবশেষে মঞ্চে এলো নায়িকা। অগ্নিপাষ্টের শাড়ীতে সে সুসজ্জিতা। তার উদ্ধত কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ গোঁজা। হেসাগের অস্পষ্ট আলোতে সে মঞ্চে এসে দাঁড়ালো অবনত মস্তকে। স্পন্দনহীন দর্শকের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। তার মুখ দেখার সুযোগ হয়নি তখনও। দেবরায়ের সম্ভাষণে মুখ খুললো দামিনী। শুরু করলো ডায়ালগ।

মাই গুডনেস! সে হা করার সাথে সাথেই হো হো করে বিপুল বেগে হেসে উঠলো তার সম্মুখভাগের দর্শককুল। গড়িয়ে পড়লো একে অন্যের গায়ে। একটি নিতান্তই শিশু সুলভ তার শিশু সুলভ কৌতুকে হাততালী দিয়ে বললো, "এ-লে! দামিনীর দাঁত উতেনি একতাও।"

ইতিমধ্যেই আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে দামিনী। কি সর্বনাশ! তার বত্রিশটি দাঁতের একটিও আর টিকে নেই মুখে! নিদারুণ বার্ধক্যে ঝরে গেছে সবগুলো! হাস্যোরোলে কেঁপে উঠলো প্যান্ডেল!

ঘটনা করুণ। সে যুগে মেয়েদের পার্ট করতো ছেলেরাই। দামিনীর রোল করতো এক সুকুমার তরুণ। সে এসে পৌঁছেনি তখনও। অচিরেই এসে পড়বে আশায় দর্শকের চাপে শুরু হয় বই। দমিনীর রোলটাও পরে। কাজেই, ও নিয়ে ভাবতে যায়নি কেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সে আর এলোইনা। দামিনীর রোল বিরাট। ওটা মুখস্ত ছিল এক মাত্র এই বৃদ্ধেরই। কাজেই, বই বন্ধ করার পরিবর্তে নিরুপায় দল এই বৃদ্ধকেই নামিয়ে দিয়েছে দামিনীর ভূমিকায়। নাই মামার চেয়ে কানা মামাই ভাল।

কিন্তু ভাল তা যতই হোক, মামাটাতো আসলেই কানা। কাজেই, লোক তো এতে হাসবেই।

তবে যতদূর মনে পড়ে সে হাসির জের টিকে ছিল বড় জোর মিনিট কয়েক। অতঃপরই দর্শকেরা আবার তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো অভিনয়। অনুভব করতে লাগলো ধর্মকর্ম আর ন্যায় অন্যায়ের পরিণতি। পরিতৃপ্ত হতে লাগলো নায়ক ও

বইঘর.কম ও রোকন

নায়িকার সুবিমল প্রেম দ্বন্দ্বে। দামিনী রূপী দন্তহীন বৃদ্ধের প্রতিচ্ছবি দু'দন্ডেই মুছে গেল দর্শকের হৃদয়ের পর্দা থেকে। সেখানে স্থান নিলো তাদের কল্পনার মাধুরী দিয়ে সৃজিত সুদূর অতীতের সেই লাস্যময়ী দামিনী।

আসলে ব্যাপারটাতো তাই। মিল্টনও বলেন, সুখ দুখে, ওসব কিছুই নয়। থিংকিং মেকস ইট সো'। নইলে দেবরায় রাধাবল্লভ পাল তো আর যুবরাজ নয়, সে কারবার করে পাতিলের। রঙ্গরায় মঙ্গল দাসও রাজ পুরুষ নয়, সে লাঙ্গল চালায় খামারে। একমানায়ক জয়ন্তও কোন জঙ্গী পুরুষ নয়, পেশা তার দোকানদারী। তবু তাদের মধ্যে দিয়ে দর্শকেরা যদি দেখতে পান বিজয় নগরের সেই রাজপুরুষদের বাস্তব উপস্থিতি, গোয়াল ঘাট গ্রামের খড়কুটোর ছাউনীটাই যদি রূপান্তরীত হয়ে যায় বিজয়নগর রাজদরবারে, তবে দন্তহীন বৃদ্ধের মধ্যে দিয়ে কেন তারা দেখবেনা সেই সুন্দরী দামিনীকে ? সবাইতো শুধুমাত্র প্রতীক!

তাই, অতীতের সেই সাদামাটা দর্শকেরা প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগী হয়ে এমন একটি অঘটনকে হাসিমুখে মেনে নিলো উপভোগ ও অনুভুতির নির্মল পবিত্রতায়। প্রতিবাদের প্রশ্ন নিয়ে খাড়া হয়নি একজনও। অথচ আজ তার একি সর্বনেশে বিকৃতি! সুন্দরী তরুণীর প্রাণবন্ত অভিনয়েও তুষ্ট নয় তারা। তারা দেখতে চায় তার নাচ। তাদের উপভোগের কেন্দ্র বিন্দু নাটক বা নাট্যানুষ্ঠান নয়, নর্তকীর অঙ্গ। তাকে উলঙ্গ করে সর্বাঙ্গ দেখার মধ্যেই সকল তৃপ্তি তাদের। ভাবি, তাই যদি আশ, তবে আর নাট্যাঙ্গনে আসা কেন, লাশকাটা কাজ নিলেই তো পারে তারা।

"– ওস্তাদ–"

আব্দুল্লাহ কখন এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, খেয়ালই করিনি। সে বললো, "এই জন্যে আর ভাল্লাগেনা ওস্তাদ। ভাবছি, যাত্রাদল ছেড়েই দেবো এবার। না দিয়ে আর করি কি ? কোন মালিকের আর লক্ষ্য আছে অভিনয়ের প্রতি, না কদর আছে অভিনয়ে-শিল্পীর ? মালিকেরা সবাই এখন ড্যান্সার নিয়ে ব্যস্ত। কার দলে কত বেশী ড্যান্সার-এইটেই এখন কম্পিটিশান। ওদের সংখ্যার উপরই এখন নির্ভর করে দলের দাম। তাই, যেখানেই যান সেখানেই দেখবেন, কুৎসিৎ রুচির মেয়ে মানুষে প্রতিটি দল ভর্তি। কোথা থেকে যে আনা হয় ওদের আল্লাহ মালুম। অভিনয় বলে আর কি কিছু আছে ওস্তাদ ? সারারাত শুধু নাচ আর নাচ। শুনলে আপনি অবাক হবেন যে যত বেশী উলঙ্গ হয়ে নাচ দিতে প্রস্তুত, তার দাম ততবেশী। কাউকে কাউকে আবার আমাদের চেয়েও বেশী পয়সা দিয়ে আনা হচ্ছে দলে।"

বইঘর.কম ও রোকন

বললাম, "খুবই স্বাভাবিক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিচ্ছেন মালিকেরা।" উত্তর তার মনোপুত হলো না। বলল, কিন্তু এতে রেজাল্ট কি দাঁড়াচ্ছে? এমনটি চলতে থাকলে, সংস্কৃতির প্রতি আর শ্রদ্ধা থাকবে কারো?

বললাম, সেটা বলা মুস্কিল। তবে বিবেচকেরা ঠিকই বুঝবেন, এর জন্যে দায়ী সংস্কৃতি নয়, মানুষের রুচির বিকৃতি। সংস্কৃতি নষ্ট করেনি মানুষকে, বরং বিদেশী কুরুচির প্রভাবে মানুষই নষ্ট করছে সংস্কৃতিকে। তোমার প্রশ্ন তোমাদের মালিকেরা দর্শকদের কুরুচিকে সহায়তা করছে কেন। কিন্তু কেন করবেনা? তারাতো আর সংস্কৃতিকে ভালবেসে সংস্কৃতি করে না, তারা করে পয়সার জন্যে। যা করলে পয়সা আসে তা তো তারা করবেই। জানোতো 'চোরা নাহি মানে ধর্মের কাহিনী।' চুরি করলে পয়সা আসে। সেই চুরি করার বিরুদ্ধে মানুষ যদি রুখে না দাঁড়ায়, চোর তো চুরি করবেই। সামাজে বেশি মানুষ নেই আব্দুল্লাহ? আর তাই রুচিপূর্ণ সংস্কৃতির ক্রমেই কমে যাচ্ছে কদর। একটা রুচিকর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়েও লোক হয় না। অথচ প্রিন্সেসদের নাম শুনেছো তো? না-না, আমি কোন এলিজাবেথ বা জাহানারার কথা বলছিনে। এই যে, হালে কিছু প্রিন্সেস গজিয়েছে আমাদের অলিতে গলিতে- প্রিন্সেস অমুক, প্রিন্সেস তমুক! হাঁ হাঁ, ওরাই। এসব প্রিন্সেসদের অনুষ্ঠানে শ'টাকার টিকেটও সাত দিন আগেই ফুরিয়ে যায় কাড়া-কাড়ির ভীড়ে। দেখায় কি ওরা? নাচ। নৃত্যকলা-ব্যাকরণের ধারে কাছে যায় না যে নাচ, সেই নাচ। কেউ কেউ আবার সোহাগ করে বলেন, ডান্স। এই ডান্সের নামে যে কি দেখায় তারা আর কি তাদের সাকুল্যে সম্পদ, সেটা তো তুমি জানোই। আব্দুল্লাহ্, যে সমাজে দেহের পসারিণীরা খেতাব পায় প্রিন্সেস (লোফারেরাও প্রিন্স উপাধি নিতে পারে যে কোনদিন), সেখানে মানীগুণি ব্যক্তিদের আত্মহত্যা করা আর সুশীলা গুণবতীদের গলায় দড়ি দেয়া ছাড়াতো আর পথ দেখিনা দ্বিতীয়। তুমি দল ছেড়ে দিলেই কি আর এসব বন্ধ হবে ভেবেছো? এক বিন্দু না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় নাকি মৌসুম আসে ব্যবসার। এটাও একটা সামাজিক বিপর্যয়ের সময় - ব্যবসার মৌসুম। সংস্কৃতির লেবেলে সবাই এখন চুটিয়ে ব্যবসা চালাতে ব্যস্ত। খেয়াল করেছো সিনেমা জগতের দিকে?

আব্দুল্লাহ এতক্ষণ এক মনে শুনছিল সব কথা। এবার সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "তা আর কি করিনি ওস্তাদ!"

বললাম, "সেখানেও ঐ একই ব্যাপার। একটা বই দেখলাম সেবার। নামটা ঠিক মনে নেই, তবে ঘটনা মনে আছে। বিশিষ্ট নায়িকা। পর্দ্দানশীন

বইঘর.কম ও রোকন

আল্লাহওয়ালা মেয়ের রোল। দেখা গেল, নিবিষ্টচিত্তে নামাজ পড়ছে নায়িকা। বিরাট এক বিষধর গোখরো তাকে দংশন করার জন্যে ফণা তুলে সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু গায়েবী মহিমার প্রভাবে সে ঐ ভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপছে আপ ফিরে গেল ফণাগুঁজে। তখন নায়িকা এক আসমানী মহিমা ও সত্যসুন্দরের প্রতিক। কিন্তু হে মোর দুর্ভাগা দেশ! পরক্ষণেই দেখা গেল প্রেমে পড়েছে নায়িকা। ব্যাস আর যায় কোথায়। শুরু হল তুর্কী লাফ। দয়িতের হাত ধরে লম্ফের পর লম্ফদিয়ে বেড়া টাটি ভেঙ্গে অলি-গলি পেরিয়ে বাঁশঝাড় ডিঙ্গিয়ে তারা চলে এলো ময়দানে–এলো এক সদ্যবোনা গমের ভুঁইয়ে। নাচের নামে ষাড়ের মতো এলোপাথারী লাফিয়ে কোন এক গরীব বেচারার বিঘা চারেক গমের চারা মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো চার পায়ে গুড়িয়ে। ডাইরেকটারকে চার্জ করলে বলবে, এটা কমার্শিয়াল দিক। এগুলো বাদ দিলে মারাত্মক ভাবে মার খাবে বই। কি বলবে বল ? এদেশে আদর্শের দাম নেই, নেই কোন সৌজন্যের বালাই। এখনে কমার্স বড়, সমাজ নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আব্দুল্লাহ ধীরে ধীর বললো, "চলুন বাড়ি যাই।"

সভ্যতায় মানুষকে করে রুচিশীল। সহায়তা করে মানুষের মন মানষিকতার উন্নতি সাধনে। রসদ জোগায় সুশৃঙ্খল সামাজ গঠনের উদ্যোগে। অজ্ঞানকে জ্ঞানবান করে পর্বতের গুহা থেকে টেনে আনে তাকে, বাস করায় পরিচ্ছন্ন গৃহে। আরামে-আয়েশে, আহারে-বিহারে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সার্বিক প্রক্রিয়ার মাঝে তার জীবনকে করে সুন্দর ও মাধুর্যময়। গ্রীক, রোমানিয়ান, এ্যাসেরীয়ান, ব্যাবিলনীয়ান, ইন্ডাসভ্যালী – সকল সভ্যতারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঐ একই কথা বলে। কিন্তু শিম্পাঞ্জীকে মানুষ বানিয়ে তাকে ফের শিম্পাঞ্জী বানানোর সীমাহীন বাসনা বিংশ শতাব্দির সভ্যতার ছাড়া আর কোন সভ্যতা ছিল বলে জানা নেই আমার। সভ্যতার এই মর্মান্তিক কৌতুক, নিতান্তই পীড়াদায়ক। বিশ্বটার অবস্থান এখন বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে। এর পতন আসন্ন বলেও অনেকের অনুমান। অনুমান, অনুমানই। এর যথার্থতা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু মানুষের রুচি ধরে রাখতে বর্তমান সভ্যতার চরম ব্যর্থতা আর বিতর্কের অপেক্ষা রাখেনা একরত্তি। আচার-অনুষ্ঠানে, আসনে সনে, ব্যবহারে-বাক্যালাপে, সাহিত্যে-সংগীতে সর্বক্ষেত্রে, মানুষের বিকৃত রুচির উলঙ্গ ছবি চোখে পড়ে লক্ষ্য করলেই। অনেকক্ষেত্রে আবার লক্ষ্য করতেও হয় না, চোখে গুতো মারে ছুটে এসেই। মানুষের এই রুচি বিকৃতির ঢেউ যে তড়িৎ গতিতে ধাবমান, তা দেখে কি ভাবনা হয় না কারো যে, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগেই আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন ? হয়তো অনেকেরই হয়। কিন্তু ঘন্টা বাঁধে কে।

বইঘর.কম ও রোকন

# আট

তাত্ত্বিকের কথাঃ জীবনে আদৌ কারো প্রেমে না পড়ার চেয়ে, পড়ে তাকে হারানোও উত্তম।

আমার কথাঃ আশাভঙ্গের নিদারুণ মর্মব্যথার চেয়ে কিছুটা মিথ্যা আশা পোষণ করাও শ্রেয়ঃ।

www.boighar.com

পরের দিন সালেহার কথায় বসে রইলাম, সারাবেলা। ধরা বাধা কথা হেনা নাকি আসবেই আজ সকালে। কিন্তু এলোনা। বিকেলে তার খোঁজে গিয়ে শুনি, সে বেড়াতে গেছে তার কোন এক বান্ধবীর বাড়ীতে। তার পরের দিনও বসে রইলাম অপেক্ষায়। কিন্তু নিষ্ফল। এলোইনা আর হেনা। বুঝলাম, বান্ধবীর বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার সময় আছে যার, তার না আসা মানে, সে আর আসবে না। শেষের দিন বাইরে বসে ভাবতে লাগলাম, এবার ঘরে ফেরা প্রয়োজন। এই অকারণ কালক্ষয় জমা খরচের খাতায় যা যুক্ত করা শুরু করেছে তা দীর্ঘাকাল সমর্থন করা যায় না। খরচের হাত খাটো করা দরকার। সালেহার জিদ –আমার আর একবার যাওয়া উচিত সেখানে। কিন্তু আমি বুঝি, সে ঔচিত্যবোধের উৎস আমার শুকিয়ে গেছে নিঃশেষে। বিষয় বিত্তহীনতার এক উড়তি খবর পেয়েই যে পিছিয়ে যায় পেছেনে, তার পেছনে ধাওয়া করা ধাত বিরুদ্ধ আমার। কাউকে সেধে যেচে কাছে টানার উৎসাহ আমার কোথায় ? তা যদি একবিন্দুও থাকতো, নাদিরাও কমরূপসী নয়, ঘর ছেড়ে পথে নামার প্রশ্নই আর এ জীবনে উঠতো না। যে পরমার্থের অপেক্ষায় কেটে গেল দুপুর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নাও যদি থাকে, বিকেলটাও কেটে যাক আশায় আশায়, তবু হতাশ হয়ে দুধের স্বাদে ঘোল খেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা করবো না। কাজেই, হেনার কাছে গিয়ে আর কাজ নেই মর্মব্যাথা বাড়িয়ে। আমার আমিত্বে আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকবো এই তো আমার ষ্টার। অতীত আমার সাফা, বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্ধকারটা অন্ধকারই থাক। সেখানেও টর্চ মেরে মহাশূন্য দেখার চেয়ে, থাক না একটা মিথ্যা আশার উৎস। কাছে গিয়ে নিঃস্ব হওয়ার চেয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে কিছু সম্বল রাখা ভাল।

সালাম সাব।

– হাউ স্ট্রেঞ্জ। সেই গোঁফওয়ালা। অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবতারণা জীবনে আমার নতুন নয়। অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিত ব্যপার। বজ্র আটুনী ফসকা গেরোর

বইঘর.কম ও রোকন

মতোই আমার সবকিছু শুরু হয় সাড়ম্বরে, শেষ হয় অশ্বড়িম্বের আকারে। মুখ তুলতেই একটা চিরকুট বাড়িয়ে ধরলো গোঁফওয়ালা। বললো, আম্মার চিঠি।

খুলে দেখি, হেনা লিখেছে, একটা বিতর্কের আসর বসেছে বাড়ীতে। আপনি তার সভাপতি। পত্র পাঠ মাত্র চলে আসুন বাবু লালের সাথে। প্লীজ, আসবেন কিন্তু অবশ্যই।'

বাহকের নাম বাবুলাল। লোকটা বাবু নয়, তার গোঁফটা কালোর চেয়ে লালই বেশী। সামঞ্জস্য আছে একটা। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার পিতার নাম কি বিহারী লাল না ব্রজলাল ? বললে আজ্ঞে না, লালু খা। বললাম, মানে। সে বলল, মানে লাল মোহাম্মদ খা।

মে গড সেভ হিজ আইডেন্টিটি।

ডেকে যখন পাঠিয়েছেই তখন না যাওয়াটা ঠিক নয়। গিয়ে দেখি, নরক গুলজার। রং বেরং এর স্ত্রীপুরুষে ড্রয়িংরুম ভর্তি। ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই বাধা দিলো বাবুলাল। বললো, এদিকে নয় ঐ সামনের ঘরে আসুন।

সামনের ঘরে ঢুকে দেখি, একা বসে হেনা। তার উস্কোখুস্কো মুখমন্ডল কাল বৈশাখীর মেঘ। আমাকে দেখেই সে আক্রমণ করলো সরাসরি। বললো, কাউকে কোন কথা দিয়ে সে কথা রক্ষে করা শুধু ভদ্রতাই নয়, মানুষের ওজনটাও যাচাই হয় তাদিয়ে। এটুকু জ্ঞান আপনার আছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আমার ক্রুটিটা বুঝলাম। কিন্তু খুশী হতে পারলাম না হেনার কথা বলার ধরণে। হঠাৎ এমন বৈরী সুলভ আচরণ করবে হেনা এটা কল্পনাও করিনি। বললাম, আপনি কি একথা শুনানোর জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে ?

ঐ একই রকম কণ্ঠস্বরে হেনা আবার বললো–

– আপনাকে কি জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি, তা জানিয়েছি লিখেই। কাউকে ব্লাফ দেয়ার অভ্যাস আমার নেই।

– ক্রুটি আমার স্বীকার করছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমি এমন কিছু করিনি, যা ব্লাফের পর্যায়ে পড়ে। সে দিন আসতে না পারলেও তার পরের দিন এসেছিলাম ঠিকই।

– আফটার দি পেসেন্ট হ্যাড ডায়েড।

মানে ?

বইঘর.কম ও রোকন

– সেটা যে আমার জন্যে কতখানি ক্ষতিকর হয়েছে তা বলে আর লাভ নেই এখন। তা ছাড়া একটা কুমারী মেয়ের আমন্ত্রণের চেয়ে বন্ধুর সাথে গঞ্জে যাওয়াটাই বড় হয় যার কাছে, তাকে বলার প্রয়োজনও নেই আদৌ।

হেনার এ ইঙ্গিতে গরম হলো কর্ণমূল। একটু উষ্ণ গলায় বললাম, কি বলতে চান আপনি ?

হেনা বললো, জানেন আপনার জন্য সারাবেলা চা নিয়ে বসে ছিলাম আমি, যা আমি কারো জন্য কোনদিন করিনি?

আপনার সেই কষ্টের জন্যে আমি দুঃখিত আর আপনার সেই বদান্যতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

শুধুই কৃতজ্ঞ ? আর কিছুই নয় ?

– আর কিছু।

– আমার সঙ্গে দু'টো কথাবলার সুযোগ পেলে বর্তে যায় কতজন, আমার হাতের একপেয়ালা চা পেলে ধন্য হয় কত রথী মহারথী– এ খবর কি রাখেন ?

– আমার কাছে সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর নয়। আর একজনের হাতের এক পেয়ালা চা পেলেই ধন্য হবো– এত ছোট আমি মনে করি না নিজেকে।

– আপনি কি তাদের চেয়েও বড় ? আসার সময় ড্রয়িং রুমের দিকে নজর দিয়েছেন নিশ্চয়ই। ওখানে যারা বসে আছেন, আপনি কি তাদের চেয়েও অধিক মূল্যবান ?

– আমার মূল্য কত সে তো জেনেই এসেছেন সেদিন। অধিক আর যাচাই করে লাভ কি ? তবে একটা কথা আপনার জেনে রাখা ভাল– পথের মানুষ হলেও আমি আমিই। দ্বিতীয় কেউ নই। ধন্যবাদ।

উঠে পড়তেই ছুটে এলো হেনা। দুই হাতে চেপে ধরলো আমার একহাত। কেঁদে ফেললো ঝর ঝর করে। বললো, দোহাই আপনার, আর যাই করুণ, লোক হাসাবেন না দয়া করে। আপনার আসার কথা অনেকেই জানে। দেখেছেও অনেকে। এসে আবার এইভাবে চলে গেলে মুখ দেখানোর পথ থাকবে না আমার।

হেনা ছুটে গেল অন্যঘরে। আমি ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম একা। খানিক পরে ডাক দিলো বাবু লাল। সে আমাকে সাথে করে নিয়ে এলো ড্রয়িং রুমে। ঘর ভর্তি লোক। আমাকে এক পাশে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল বাবু লাল। তখন

বইঘর.কম ও রোকন

জমজমাট আসর চলছে সঙ্গীতের। দেখলাম, অভ্যাগত ছাড়াও অনাহুত অতিথিদের ভীড় জমেছে চারদিকে। সকলেই গান নিয়ে তন্ময়, আমার উপর নজর দেয় কে। চুপ করে শুনতে লাগলাম গান। এক আধুনিকা সপুলকে গাইছেন, ফুলের বনে অলির মেলা,. মোর কাননে অলি নেই।' তার বিলাপের যথার্থতা অনুধাবন করতে আমার দেরী হয়নি আদৌ। বুঝতে পারলাম, তার অলিকুলের হরতালের কারণ। সেটা তার রূপ নয়। চেহারা তার মোটা মুটি ভালই। সমস্যা তার কন্ঠ। এমন পুরুষোচিত গলা অনেক পুরুষেরও নেই। চেহারা না দেখে শুধু কন্ঠ শুনে এলে তার কাননে অলিনীরা আসতে পারে ঝাঁকে ঝাঁকে, কোন অলি আসার কিছুমাত্র কারণ নেই। তবু ভদ্রতার কারণেই তার গান শেষ হতেই হর্ষোৎফুল্ল আওয়াজ এলো- আর একখানা, আর একখানা।

আল্লাদে আটখানা হয়ে ভদ্রমহিলা আর একখানা গাওয়ার উদ্যোগ করতেই ঘরে ঢুকলো হেনা। পরনে তার একে বারেই সাদা মোটা আটপৌরে পোষাক। সে ঘরে ঢুকতেই পাল্টে গেলা পরিস্থিতি। সবাই হেনার দিকে তাকিয়ে কলকণ্ঠে বলে উঠলো, কি আশ্চর্য। সেই গেলেন আর এলেন এতো পরে ? এটা ভারি অন্যায়। সবাই আমরা উদগ্রীব আছি আপনার গান শোনার জন্যে– আর আপনি আসি বলে নেই ?

অভিযোগের সুরে হেনার খালা বললেন, কি এমন কাজ ছিলরে ভেতরে ? এরা সবাই বসে রইলেন এখানে, আর তুই বেরিয়ে গিয়ে করলি কি ? সবাই এতো করে বলছেন, গা না একখান গান।

হেনা একপলকে আমায় একটু দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হারমোনিয়ামের কাছে। পূর্ববর্তী গায়িকাটি বিদ্যুৎপিষ্ট রোগীর মতো পান্ডুর মুখে ছেড়ে দিলেন হারমোনিয়াম। হেনার আগমনে আর একটু বিলম্ব কেন হলো না, এই তার মর্মব্যথা। হারমোনিয়ামে টান দিয়ে গান ধরলো হেনা, -

'শুধু মুখের কথাটি শুনে গেছো তুমি, শোননি মনের ভাষা।' আলতো চোখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে সে গাইতে লাগলো সম্মোহনী সুরে। দরদ দিয়ে গান গাইতে অনেককে দেখেছি। এমন ভাবে হৃদয় ঢেলে গাওয়ার নজীর বিরল। গান শেষ হওয়ার পরও মনে হলো একটা বেদনা সিক্ত করুণ সুর তখনও ঝরে পড়ছে ঘরে বাইরে সর্বত্র। বুঝলাম, হেনা শুধু রূপসী আর বিদুষীই নয়, একজন উঁচুদরের গয়িকাও বটে। উদগত অশ্রুধারা সম্বরন করতে করতে হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে উঠে এলো হেনা। বসলো তার পাশের এক সিটে। বিপুল হাত তালি, ভুয়শী প্রশংসা এবং আর একখানা গানের জন্যে সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ-

বইঘর.কম ও রোকন

কোন কিছুতেই বিচলিত না হয়ে নিজের মধ্যেই নিজেকে সমাহিত করে সে বসে রইলো নীরবে। হেনার এক বান্ধবী তার কাছে এসে বললেন, "কিরে হেনা, গাইবিনা আর সত্যিই ?" হেনা মাথা নেড়ি অসম্মতি জানালো। কোন মতে বললো, আর মুড নেই। তা শুনে বান্ধবীটি বললেন, তাহলে ভাই আমাদের কাজটা সেরে দে, আমরা উঠি।

ট্রে ভর্তি চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো বাবুলাল। কি তার অনুমান, তা সেই জানে। চা নিয়ে সে সরাসরি চলে এলো আমার কাছে, সবার আগে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল কাপ। এতক্ষণ নজরে পড়িনি একজনেরও। এখন পড়লাম সকলের কোপ নজরে। গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতো হেনা আরো ফাপিয়ে তুললো পরিস্থিতি। সে রে রে করে ছুটে এসে সরিয়ে নিলো কাপ। বাবু লালকে শক্ত একটা ধমক দিয়ে আমাকেও ছোট্ট একটা ধমক দিলো হেনা। বললো রাখুন, খালি পেটে চা খেয়ে কাজ নেই। পানাহারের তুফান ছুটছে যেখানে, সেখানে আপনাকে শুকনো এক কাপ চা বাড়িয়ে দেয়া মানে আমাকে জব্দ করা, সেটা বুঝতে পারেন না ? আগে নাস্তা আসুক তার পর। জ্বলতে লাগলো হেনার চোখ। তা দেখে আতকে উঠে দৌঁড় দিল বাবুলাল। আর সকলের চোখ তখন ছানাবড়া। সবার মুখে একই প্রশ্ন – কে উনি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে জড়তাহীন কণ্ঠে হেনা এবার বললো, আমি দুঃখিত। ইনার পরিচয়টা দেয়াই হয়নি এখনও। ইনি ফরহাদ আহমেদ। আমার একান্ত বন্ধু। ক্লোজ ফ্রেন্ড বলতে যা বুঝায় ইনি তারও অধিক। কোন ডিগ্রীধারী নন ইনি, তবে পন্ডিত মানুষ। লতিফাদের ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশান দেয়ার জন্যে আমি এঁকেই ডেকে এনেছি।"

চমকে উঠলাম ভুত দেখারও অধিক। আজ একি সর্বনেশে জিদ চেপেছে হেনার। লক্ষ্য করে দেখি, রক্তশূন্য হয়ে গেছে উপস্থিত তরুণদের মুখমন্ডল। তরুণীদের স্থিরনেত্রে এক সাগর বিস্ময়। ঘনিষ্ঠ তো দূরের কথা, কোন পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে হেনার, এটা কেউ কল্পনাও করেনি কোন দিন। আমার সন্দেহ হলো, হেনা এখন সত্যি সত্যিই সজ্ঞানে কি না।

কিন্তু কাউকে কোন বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়ে হেনা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাক দিয়ে বললো, আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই সবার সাথে।

একে একে সকলের পরিচয় পেয়ে জানলাম, অভ্যাগতদের অধিনায়ক একজন তরুণ বি এস সি ইঞ্জিনিয়ার। উনি হেনার খালুর ভাগ্নে। নাম মিঃ তৌহিদ হোসেন (ডাব্লুউ)। অন্যেরা সব তার বন্ধু ও বান্ধবী। বন্ধুদের কেউ ডাক্তার, কেউ

বইঘর.কম ও রোকন

প্রফেসর, এ্যাডভোকেট, কন্ট্রাক্টাকার ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এরা সবাই তরুণ। তার বান্ধবীরাও সংখ্যায় অনেক, বয়সে তরুণী এরা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বন্ধুদেরই বোন ভাগ্নী। এই আসরে স্থানীয় অতিথিও ছিলেন কিছু। স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও শিক্ষিকা। এদেরই একজন হেনার বান্ধবী। নাম লতিফা। সবার সাথে সালাম বিনিময় শেষ হতেই নাস্তা হাতে হাজির হলো বাবুলাল। হেনা আমার পাশে বসে নাস্তার প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললো, ইনাদের সবার হয়ে গেছে দুই দফা। আপনি এবার সেরে নিন। কাজ আছে।

আমি শুরু করতেই 'একটু আসি' বলে উঠে গেল হেনা। আহারে মন দিয়ে মনে মনে একটি কথাই ভাবতে লাগলাম, হেনার এই আচরণ, তার এই উক্তি– একি সবই সত্যি, না এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে হেনার।

পরে বুঝলাম, সত্যি সত্যিই, উদ্দেশ্যও আছে একটা। চা নাস্তা সেরে একটু বাইরে আসতেই , আমি চলে যাচ্ছি ভেবে, আমার পিছে পিছে বাইরে এলেন হেনার সেই বান্ধবী, লতিফা। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কথায় কথায় তার কাছে যা জানলাম, তাহলোঃ এই ইঞ্জিনীয়ারের সাথে বিয়ের কথা চলছে হেনার। হেনার মাতা পিতা আত্মীয়স্বজন- সবাই চান, এ বিয়েটা হোক। কিন্তু হেনা তা চায় না। শুধু এইটেই নয়, এর আগেও অনেক সম্পর্ক ভেঙ্গে দিয়েছে হেনা। কি কারণ তা হেনাই জানে বেশী। লতিফার কথায় যা বুঝলাম, তা হলো, এইসব আটপৌরে ছাচে ঢালা মানুষ সম্বন্ধে কোন উৎসাহই নেই হেনার। তবু হেনার পিতার উপর্য্যুপরী তাকিদে হেনার খালু দাওয়াত দিয়ে বাড়ী এনেছেন ভাগ্নেকে। দাওয়াত পেয়ে ভাগ্নে এসেছেন সবান্ধবে, কনে দেখার, বিয়ে করার মায় বাসর ঘর, ফুল শয্যার সব আয়োজন সঙ্গে নিয়ে। আজ সন্ধ্যার মধ্যে এসে পড়বেন হেনার মাতাপিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা। এ বিপদে পড়তে হতো না হেনাকে, যদি সে আমার সাথে সাক্ষাত হওয়ার পরের দিনই চলে যেতো এখান থেকে। তার সদ্য বিবাহিত সেই মাতুল লোক পাঠিয়েছিলেন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমার আবার আসার কথা থাকায় সে অপেক্ষা করে আর একদিন। সালেহার সাথে কথা বলে এসেই সে সংবাদ পায় এই দুর্ঘটনার। তার খালুটি বাড়ী ফিরেই ফিরিয়ে দিয়েছেন হেনার সেই মাতুল প্রেরিত লোককে এবং কোমর বেঁধে লেগে গেছেন ঘর দোর গোছাতে। পালাবার পথের খোঁজে হেনা ধাওয়া করে তার এই বান্ধবী লতিফার বাড়ী পর্যন্ত। কিন্তু ফল হয়না কিছু। অগত্যা সে রয়ে গেছে এখানেই। আর পাঁচটা সম্পর্কের মতো এটাকেও নস্যাৎ করে দেয়ার পরিকল্পনা এটে নিয়ে।

পুনারায় ভেতরে আসতেই হেনা এসে কয়েকখানা বই রাখলো টেবিলে। আমাকে ডাক দিয়ে পাশে বসিয়ে সামনে দিলো দুইখানা বই। বললো, সবগুলো দরকার নেই। এ দুটোতে একটু চোখ বুলিয়ে নিন। আপনাকে ডিসিশান দিতে হবে-একটা টিচারকে ফেয়ারওয়েল দেয়ার বেলায় এ দু'টোর কোনটা দেয়া ভাল।

এর প্রতিবাদে একজন তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন, না না, একটু চোখ বুলিয়ে কি হবে ? আগাগোড়া পড়তে হবে, বুঝতে হবে। এত সময়ও নেই, আর এটা যার তার কাজও নয়। ওসব না করে আমরা যেটার কথা বললাম, ওটেই দিয়ে দিনগে।

বই দু'টো হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম দেখে। দু'টোর একটি আমারই লেখা বই। অবৈধ অরণ্য। ভাগ্যের এই পরিহাসে হাসি পেলো আমার। অপরটিও পড়া বই ফ্লায়িং গার্ল। হাল আমলের উলঙ্গ সেক্স ভিত্তিক থ্রিল স্টোরী। এক বিদেশী উপন্যাস থেকে চুরি করা কাহিনী। একা একা পড়তে হলেও লজ্জায় খিল দিতে হয় দুয়ারে। বই দু'টো নাড়া চাড়া করতে দেখেই হেনা সকৌতুকে বললো, অবাক হচ্ছেন না ? ফরহাদ আহমেদ বাংলাদেশে একটা নেই, আরো আছেন। তাঁরা সবাই ফা-হিয়েন আর হিউয়েন সাং এর সাগরেদ নন। পথে পথে ঘুরে বেড়ান না সারা জীবন। ঘরে বসে অনেক ভাল এবং বড় কাজও করেন।

মুখটিপে হাসতে লাগলো হেনা। এর অর্থ উপলব্দি কারার মতো লোক আমি ছাড়া আর একজনও নেই এই আসরে। একটু মুচকি হেসে বললাম, দু'টিই আমার জানা বা পড়া বই। কিন্তু এতে মতামত দেয়ার এমন কি প্রশ্ন উঠলো বলুনতো ?

www.boighar.com

হেনা যা বললো তার সারমর্ম এই যে, এই শিক্ষকেরা হেনার কাছে এসেছিল বই বাছাইয়ের ব্যাপার নিয়ে। সাহিত্যে হেনার জ্ঞান আছে অনেক এই এদের ধারণা। বিদায়ী শিক্ষকের নিজের চয়েস ফ্লায়িং গার্ল। বই দিলে তাকে ওটাই দেয়া হোক। আকারে ইঙ্গিতে একথা তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু এনিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এখানে এই আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন উপস্থিত সকলেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁর দলবলেরও চয়েস ঐ ফ্লায়িং গার্ল। তাদের যুক্তি- রিডিংটা প্লেজারের জন্যে, রেডি এন্‌জয়মেন্টের জন্যে। ফ্লায়িং গার্ল এ এসব আছে প্রচুর। অবৈধ অরণ্য তত্বকথার বই- রোমান্সহীন যত্তসব বাজে দূর্বোধ্য ব্যাপার।

যদিও আমার মত একটা লোক এদের মতের উপর মাতব্বরী করুক এরা তা চায়না। তবু একটু নীরব থেকে প্রকাশ করলাম রায়। ফ্লায়িং গার্ল বইটি শূন্যে তুলে ধরে বললাম, আমার চয়েসও এই ফ্লায়িং গার্ল।

বইঘর.কম ও রোকন

সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালী। বুঝলাম, হেরে গেলো হেনারা কয়েকজন। বেদনা ক্লিষ্ট বদনে হেনা আমাকে প্রশ্ন করলো, আপনার এই সিদ্ধানের পেছনে যুক্তি ?

জানতাম, এ প্রশ্ন তুলবে হেনা। বললাম, অবৈধ অরণ্যে রেডি প্লেজার কম। প্লেজার যা আছে তা উপলব্ধির করার মতো জ্ঞান সম্পন্ন পাঠকও কম। কাজেই ওটা অচল।

হেনা প্রতিবাদ বললো, কিন্তু যাকে দেয়া হবে তিনি একজন হাই স্কুলের টিচার।

যোগ দিয়ে বললাম, এবং হাল আমলের টিচার।

কথাটা তলিয়ে না দেখেই হেনা বলল, সে যাই হোক, একজন টিচার তো ? রীতিমতো জ্ঞান সম্পন্ন পাঠক।

বললাম, দেখুন, যে পাঠক নিজেই ফ্লায়িং গার্ল চয়েস করেন, তিনি জ্ঞান সম্পন্ন পাঠক নন। রুচি তার সস্তা, জ্ঞান তার অগভীর।

হেনা এবার আমতা আমতা করে বললো, কিন্তু অন্য টিচারও তো পড়বেন বইটা ? তারাও কি বুঝবেন না ?

বললাম, কে বুঝবে আর না বুঝবে, এটা নির্দ্ধারিণ করা শক্ত। একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারেন আবার একজন টিচার না বুঝতেও পারেন। আসলে ব্যাপার কি জানেন অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদ দিলে, টিচার পদবীটা আজ আর কোন জ্ঞান গরিমার প্রতীক নয়। বরং আজ কাল দেখা যায়, অজ্ঞানদের ভীড়ই ওখানে অধিক। অসৎ কর্তৃপক্ষের স্বার্থপরতায় অযোগ্য আত্মীয় স্বজনেই আজ কাল ভরে যাচ্ছে বিদ্যালয়। আর্গুমেন্টাম এ্যাডবেকুলাম' বুঝেন তো ? লাঠির জোরে এখন ওদের প্রভুত্বই ওখানে জমজমাট। বিজ্ঞশিক্ষক এখন সর্বত্রই উপেক্ষিত। জ্ঞান আর নীতি নিয়ে সংখ্যা লঘিষ্ট অবস্থায় ওরা পড়ে থাকেন এক কোণে। আর শুধু শিক্ষকদের কথাই বলি কেন, অল্পকিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে গভীর জ্ঞানের অভাব সর্বত্রই। ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে আমরা এখন কর্তৃত্ব করছি সব কিছুতেই। সিদ্ধান্ত দিচ্ছি সব সমস্যায়। ঐ গল্পটা জানেনতো ? ঐ যে সোমনাথ মন্দিরের গপ্পটা ? সকলের জানা গপ্প। ইমপ্লিকেশানটা অধিক বলেই রিপিট করছি। এক স্কুলের ইন্সপেকটার ভিজিটে এসে ইতিহাসের ক্লাশে ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন– সোমনাথের মন্দিরটা কে ভেঙ্গেছে বলোতো ? ভড়কে গেলো ছাত্রেরা। মন্দির ভাঙ্গা ভাঙ্গির ব্যাপার। তারা সমস্বরে বললো, না স্যার, আমরা কেউ ও মন্দির ভাঙ্গিনি। ইন্সপেকটার তখন ইতিহাসের শিক্ষককে বললেন, বলে

বইঘর.কম ও রোকন

কি আপনার ছাত্রেরা। শিক্ষকটিও জোর দিয়ে বললেন, ওরা ঠিকই বলেছে স্যার। এ ক্লাসের ছেলেরা খুব শান্ত। অন্য ক্লাশের ছাত্ররা হয়ত ভেংগে থাকবে ওটা। একথা হেডমাষ্টারকে বলায় তিনিও অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বললেন, আমার স্কুলের ছাত্রদের অত দুঃসাহসই নেই স্যার। সোমনাথের মন্দিরটা নিশ্চয়ই অন্য স্কুলের ছাত্ররা ভেঙ্গেছে। অসহায় ইন্সপেক্টর এ কাহিনী লিখে জানালেন উপরে। ক'দিন পরই উপর থেকে চিঠি এল। উপরওয়ালা জানালেন, সোমনাথের মন্দিরটা কোন স্কুলের ছেলেরা ভেঙ্গেছে তা যখন নির্ণয় করা যাচ্ছেনা, তখন মন্দিরটা মেরামত করতে কত লাগবে এস্টিমেট করে পাঠান, টাকা পাঠানো হবে।

শুনে খিল খিল করে হেসে উঠলো হেনা ও কয়েকজন। সকলেই নয়। কারণ ঐ একই।

একটু দম নিয়ে বললাম, এই হলো সর্বত্রই আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির পরিধি। এখানে এ্যাবস্ট্রাক্ট বস্তু অচল। জ্ঞানের কথা অপাংতেয়। এখানে অর্থ আর রেডি প্লেজার সকলেরই কাম্য। আমরা বিদায় করেছি রুচি, হারিয়ে ফেলেছি গভীরতা, বেঁচে খেয়েছি অনুভূতি। আপনি আপত্তি করে করবেন কি ?

সংশয়মুক্ত হয়ে এবার হাসতে লাগলো হেনা। বললো, "ও! তাই বলুন।" উঠে পড়লেন শিক্ষকেরা। তারা যাওয়ার সময় বললেন, আমরা পেয়ে গেছি সিদ্ধান্ত।

বেলা গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। ঘরে ঢুকলেন হেনার খালা। দুপুরের আহারের তাগাদা দিয়ে খাবার টেবিলে যাওয়ার জন্যে তিনি সবাইকে জানালেন সবিনয় অনুরোধ। আমি উঠে প্রস্থানোদ্যগ করতেই তিনি বললেন, সেকি। তুমি আবার যাচ্ছো কেন বাবা ? এসো এসো, সবার সঙ্গে দু'টো খেয়ে তবে যাবে।

সংগে সংগে প্রতিবাদ করলো হেনা। বললো, কেন ? উনি খেতে যাবেন কেন? তোমরা কি কেউ দাওয়াত করে এনেছো উনাকে, না উনি আসার পরও ভদ্রতা করে দাওয়াত একটা দিয়ে রেখেছো আগে ? একটু চা নাস্তার ভদ্রতা সেটা আমি সেরে দিয়েছি তোমরা না বললেও। যাদের তোমরা দাওয়াত করে এনেছো, তাদের যেন কোন ত্রুটি না হয়, সবাই মিলে সেইদিকটাই সামলাওগে।"

তার খালাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হেনা আবার আমাকে লক্ষ্য করে বললো, আপনি চলে যান এখনই। দুপুরের খাবার যদি একান্তই না জোটে, নদী থেকে কয়েক আজলা পানি খেয়ে নেবেন। তবু আমি কারো দয়ার খানা এভাবে খেতে দিতে পারিনা আপনাকে।

বইঘর.কম ও রোকন

এক রকম জোর করেই হেনা আমাকে নামিয়ে দিলো পথে। তার চোখ থেকে টশটশ করে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা পানি।

এরপরও হেনাকে বিয়ে করার দুঃসাহস ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করার অপেক্ষায় না থেকে, আব্দুল্লাহদের শুভাশীষ জানিয়ে পরের দিনই ফিরে এলাম বাড়ীতে।

# নয়

দিনটা কেমন যাবে তা সকাল দেখলেই বোঝা যায়– বুজুর্গদের বাণী, চলিত প্রবাদ। অপবাদ দিতে চাইনে, তবে এর অর্দ্ধেকটা বাদ দিয়ে বললে প্রবাদটির সমর্থনে আমি গোন্ডা বিশেক বুকডন দিতেও প্রস্তুত। কারণ, সকালটা ভালভাবে শুরু হলে দিনটা ভাল-ভাবে যায়, এমন কোন প্রতীতি আমার নেই। তবে সকালটা মন্দভাবে শুরু হলে গোটা দিনটাই যে মাঠে মারা যায়, এমনটি বিশ্বাস করার আমার কারণ আছে অনেক।

বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পরের কথা। রাতটা ছিল ভাগ্য লিখনের। বিধাতা কার ভাগ্যে কি লিখলেন জানিনা। আমার ভাগ্যে যা লিখলেন, তা জানতে পারলাম পরেরদিন সকালেই। সেটা, খোদা বক্সী বিস্ফোরণ। ওটা দিয়েই শুরু হলো সকালটা। আগের দিনের কলের গান আর বর্তমানের টেপরেকর্ড ননস্টপ বকে যাওয়ার তাকদ রাখে। আল্লাহর রহমে আমার খোদাবক্সও এই তাকদের ষোলআনার অধিপতি। খোদাবক্সের মেজাজ মর্জি যদি খোদার মর্জ্জি বিগড়ে যায় একবার, তখন সে ননস্টপ মেসিন। তাকে থামায় সাধ্য কার। সকাল বেলা বাজার থেকে ফিরেই খোদাবক্স মাথায় তুললো বাড়ীটা। বেপরোয়া বাকমাহাত্মে বিষিয়ে দিল মন অসহ্যবোধে বেরিয়ে এসে দেখি– একপক্ষীয় লড়াই। প্রথমপক্ষ খোদাবক্স। দ্বিতীয় পক্ষ কে বা কোথায়, তা একমাত্র বলতে পারে খোদাবক্স নিজে আর খোদাতায়ালা স্বয়ং। আমাকে দেখেই পরামর্শ দিতে লাগলো সে, তাও আবার অদ্ভুত। এখনই আমাকে বেঁচতে হবে বাড়ী ঘর, বাধতে হবে বিছানাপত্তর, নামতে হবে পথে। যেতে হবে কোথায়, তা অবশ্য জানা নেই খোদাবক্সের। খোদাবক্সের ভাষায়, "ওরেশ শালার শালারে। এ আমরা কোন জায়গায় আছিরে। এতো দেখছি সেই শালার সাংঘাতিক ব্যাপার। মুড়ি মুড়কি একদরে বিক্রি হওয়া দেখে গুরু দিলো দৌড়, আর গোমুখ্যু শিষ্যটা সস্তা খেয়ে নাদুস নুদুস হওয়ার লোভে থেকে গিয়ে মরতে বসলো শুলে চড়ে! ওরে বাপ্! এখানেও সেই কাণ্ড!

বইঘর.কম ও রোকন

যার সখ আছে শূলে চড়ার, সে থাকুক পড়ে এখানে। আমি কেন মরতে যাবো জেনে শুনে ? আমি কি ঐ শিষ্যের মতো গোমুখ্যু গাল্টুমাল ? আমার ঘেলু নেই মাথায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র হলেও বিষয়টি চিন্তার বিষয়। চিনির দাম বেশী দেখে খোদাবক্স গুড় কিনতে গিয়ে দেখে গুরের দাম আরো বেশি। গুড় চিনির দর যেখানে এ রকম, সেখানে ভালমন্দের বিচার আর ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বলে কোন কিছু থাকার কথা নয়। পুরানো দিনের মানুষ এই খোদা বক্স। কাজেই, সে আর থাকবে না এখানে এক দিনও। শুলে চরার ইচ্ছে নেই তার একটুও। একেবারেই ফেলে দেয়ার ব্যাপার নয়। এসবই এখন বাজারের দৈনন্দিন ব্যাপার। এখন জিনিষের দাম নির্ভর করে বিক্রেতার বুকের ছাতির উপর, অন্য কোন নীতির উপর নয়। সাহস করে দাম একটা হাকতে পরলেই হলো। ভদ্রলোকের মুখের কথাই আইন, এটা জানতাম। দোকানদারের মুখের কথাই দর এটা এখন শিখছি। অবস্থা যেখানে এই, সেখানে শূলে চড়ার ভয় না থাকলেও বাজার দরে বিভ্রান্তদের ঝুলে পড়া রোধ করবে কে ?

খোদাবক্সকে অতি কষ্টে শান্ত করে বললাম, "হে ভ্রাতঃ। দেশের সর্বত্রই প্রায় এই একই অবস্থা। এখান থেকে আর যাবো কোথায় ?" সে ফস করে বললো, "কেন অন্যদেশে।"

বললাম, "ব্রাদার, আগেকার রাজা-বাদশাহদের রসবোধ ছিল প্রচুর। রাজ্যের যে কেউ যথা ইচ্ছা যেতে পারতো। কিন্তু এখনকার উনারা বড় বেরসিক। এখন অন্যদেশে যেতে হলে পারমিশান লাগে, পাসপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে, পয়সা কড়িও পাল্টে নেয়া লাগে। ওসব ছাড়া যাওয়ার চেষ্টা করলে আবার পিঠে পুরুষ্ট করে ছালা বাঁধা লাগে। অতশত করতে গেলেও আবার প্রাণটা আসি যাই করে। আসি বলে গিয়ে আবার আসেও না অনেক সময়। তার চেয়ে বরং মজাসে গুড়ের বদলে চিনি খেয়ে তাইরে নাইরে না বলে কাটিয়ে দিই কিছুদিন। অতপর এক শুভদিন দেখে মওলা বলে দুই বেরাদর লটকে যাবো একসাথে। অমর কে ভুবনে।

খোদাবক্সকে বিদায় করে লেখার টেবিলে বসলাম। দিনটা ছিল ফাঁকা। সাধ ছিল প্রাণভরে সাহিত্য করবো আজ। কিন্তু আমার সাধনা মিটিল । শুরু হলো পদে পদে বিঘ্ন।

দু'লাইন না এগুতেই শ্লীপ হাতে হাজির হলো খোদাবক্স। বাসা ভাড়া নেয়ার জন্যে কে একজন এসেছেন। শ্লিপ দিয়ে দেখা করার কোন নিয়ম এখানে নেই।

বইঘর.কম ও রোকন

খোদাবক্স জানালো, উনি নিজেই এগিয়ে দিলেন শ্লীপ। শ্লীপটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম। এল, আর, খান আই, সি এস.।

কি সর্বনাশ। বৃটিশ আমলের আই. সি এস. আজকের সেক্রেটারীদেরও নমস্য। সেই লোক বাড়ীতে। লাফ দিয়ে উঠে গুছাতে লাগলাম বিছানা পত্তর, টেবিল চেয়ার। বেরিয়ে আসতে দেরী হলো কিঞ্চিৎ। এসে দেখি, উনি নেই। হতভম্ব হয়ে গেলাম। একধারে অন্য একজন লোক পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, মিঃ আর এল আর খান।"

উনি হাসতে হাসাতে বললেন, আমিই মিঃ এল. আর. খান।

ধারিত্রী দ্বিধা হও। এই লোক আই. সি. এস.। একেবারেই গবু চন্দ্রীয় গেটআপ, বাদুর চোষা চেহারা। আনশেভড মুখ, আনব্রাশড চুল, আনএ্যাপ্রুভড ষ্টাইল। গায়ে পাঁচমিশালী পোষাক, দাঁতে তাম্বুল রসের পুরুষ্টু আস্তরণ। সবচেয়ে অধিক যা লক্ষণীয়, তা হলো, তার বয়স। বৃটিশ শাসনের শেষ দিনেও তার দুধের দাঁত সবকটিই অক্ষত থাকার কথা। এই লোক আই. সি. এস. হয় কি করে। বললাম, "আমি আই, সি. এস. এল. আর. খানের –।"

কথা আমার শেষ করতে দিলেন না । সমুদয় দন্তরাজী প্রস্ফুটিত করে বললেন, "হে - হে - আমিই আই. সি. এস।"

আগুন ধরলো মাথায়। রুক্ষকণ্ঠে বললাম, আই. সি. এস! আই. সি. এস. মানে ?

লোকটি তার জবাবে বললো, মানে ইনসপেকটর কো অপারেটিভ সোসাইটিজ।

আহম্মক আর বলে কাকে। আর একদন্ত না দাঁড়িয়ে চলে এলাম ভেতরে। মুডটা আমার একবারেই আপসেট করে দিয়ে গেল নাদানটা। ওকে দেবো বাড়ী ভাড়া। তবেই হয়েছে। খানিকক্ষণ পায়চারী করে ধীরে সুস্থে বসলাম আবার লেখায়। পীর মুর্শিদের নাম নিয়ে পুনরুদ্দমে কলম ধরতেই পুনরায় ভূমিকম্প।

–"আসসালামু আলাইকুম ভাই সাহেব, খুব মৌজেই আছেন দেখছি। শুধু লেখা আর লেখা। ওসব চেড়ে আখেরাতের কাজ কাম কিছু করেন।"

পর্দাঠেলে ঘরে ঢুকলেন এক কবি ও কলন্দর। ধুরন্ধর ব্যক্তিও বলা যায়। ভদ্রলোকের আজীবন লক্ষ্য বিভব, উপলক্ষ বিভু। তিনি পরিধান করেন পায়জামা ও আসকান। মাথায় দেন পৈতৃক কালের ক্যাপ। সব কিছুই তৈল চর্চ্চিত। সাবান

পানির সাক্ষাৎ ওরা ইহজনমে পায়নি, ভবিষ্যতের আশাও ক্ষীণ। ভদ্রলোকের রোগ আছে কোষ বৃদ্ধির, যোগ আছে কন্যারাশির। গৃহ আছে একাধিক, গৃহিণী আছে ততোধিক। আরো অধিক দ্বার গ্রহণের অপচেষ্টায় গ্লাণী আছে অনেক। শরিয়তের সম্মানে উনি কদাচিত ছায়া মাড়ান নাছারার, বেশরাদের সালাম নেন কুঞ্চিত নাসিকায়। দীনের বাণী নিয়ে আমার মতো বেদীনের অন্দরে এহেন দীনমনির আবির্ভাবে প্রমাদ গুণলাম মনে মনে।

কথায় কথায় উনি ব্যক্ত করলেন তার আগমনের উদ্দেশ্য। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের সাথে আমার সদ্ভাব আছে যথেষ্ট। তাকে একটু আলতু ফালতু বুঝিয়ে মিসগাইড করলেই একটা মোটা অংকের অর্থ আসে ভদ্রলোকের হাতে। লা খরচা কাজও চাননা তিনি। আমার পারিশ্রমিকটাও তিনি তুলে ধরলেন সাড়ম্বরে। তাঁর যুক্তি– কাঞ্চন প্রাপ্তির পথে কিঞ্চিত ইদংমিদং দূষণীয় নয়।

শুনে কিঞ্চিত নীরব থেকে বললাম, "ভাই সাহেব, একেবারেই নালায়েক নাদান ব্যাক্তি আমি। ঈমান্ বড় কমজোর। কাজটা বেশ শক্ত। কোন শক্ত ঈমানের লোক ছাড়া এমন কাজ উৎরানো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি অন্যরাস্তা দেখুন।

অনেক চেষ্টা করেও আর আশা নেই দেখে উনি যাবার সময় বললেন, যে, এটি একটা নিছক ঠাট্টা। কেবলমাত্র আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই এমন না ফরমানী প্রস্তাবটা পেড়েছিলেন উনি। বুঝলাম, বেহুদাপনাতেও বাহাদুরী আছে তার।

ভদ্রলোক বিদেয় হতেই ঘরে ঢুকলেন রুহুল আমিন সাহেব। বললেন, "কি সর্বনাশ। উনি এসেছিলেন আপনার কাছে। এই সেদিনইতো আপনি যাত্রা থিয়েটার করেন বলে কত দুণাম গাইলেন আপনার। প্রকাশ্য সভায় উনি বললেন, আমি নাকি আলসার অব দি সোসাইটি।"

হাসতে হাসতে বললাম, "এ আর এমন কি সাহেব। মুসলমান আমরা সবাই ভাই ভাই। উনি আমার বয়সে বেশ বড়– অর্থাৎ বড়ভাই। বড় ভাই যেখানে সমাজের গ্যাংগ্রীণ ছোট ভাইয়ের সেখানে আলসার হতে দোষ কি।

আর এক কাপ চা খেয়ে পুনরায় লিখতে বসেই উঠতে হলো আবার। মোকর্দ্দমা করার জন্যে গ্রাম থেকে এসেছেন এক মুরুব্বী। চেনা জানা মানুষ, আসকান মিয়া নাম। মানে বড়, কানে খাটো, টানের রুগী মানুষ। মান তার বিপন্ন। আমার পরামর্শ চান তিনি। একে পাশের গ্রামে ঘর, তদুপরি ভর

বইঘর.কম ও রোকন

করেছেন ঘাড়ের উপর। কি আর করি। উঠতেই হলো। তার কাছে গিয়ে শুনি, ঘটনা চিরন্তন। সেই পুরাতন কাহিনীঃ

পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,

জানো নাকি মস্ত কুলিন ও যে।

একমাত্র মেয়ের বিয়ে মেয়ের মা বললেন পাড়ার ছেলে বাসেত আলী বি, এ, পাশ বর। দর্শনধারী ছেলে। বিষয় আছে, বিত্ত আছে, মেয়ের সাথে অল্পবিস্তর আসনাইও আছে। এই বরই চাই। বাপ বললেন, খামুশ। রূপগুণটাই বড় নয়, কূলমানটাই বড়। তাছাড়া দুনিয়ার খেলা দু'দিনের। পরকালটাই আসল। মেয়ের এই আসল দিকটা এড়িয়ে গেলে চলবে কেন ?

কর্তার ইচ্ছে কর্ম। বর হিসাবে বাসেত আলীকে বাতিল করে আসকান মিয়া বেছে নিলেন দীনের রাহের এক পেশাদার ভিনদেশী খাদেমকে। তাকে পেলেন এক মাহফিলে, নিয়ে এলেন মহলে, মুরিদ হয়ে মাসাধিককাল মজে রইলেন খাদেম সাহেবের খেদমতে। বাড়ীর হাঁস মুরগী শেষ করলেন, হাঁড়ির খরচ বাড়িয়ে দিলেন, মিষ্টির বাজার গমর করলেন আগরবাতি জ্বালিয়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দহলীজ গুলজার রাখলেন সর্বক্ষণ। অবশেষে এক শুভক্ষণ দেখে শুধু কন্যারই নয়, গুষ্টি সমেত সকলেরই পুলছেরাত পাড়ি দেয়া নিশ্চিত করলেন, খাদেম সাহেবকে জামাই করে অন্তঃপুরে তুলে। অতঃপর আরো মাসকয়েক হাঁসমুরগী খেয়ে, মৌজের মৌতাতে মজাছে তা দিয়ে আসি বলে সেই যে কেটে পড়েছেন খাদেম বাবা, ফেরেন নি আর অদ্যতক।

অনেক খোঁজা খুঁজির পর জামাইমিয়ার চাল চুলাও খুঁজে পাননি আসকান মিয়া। তার বদলে খুঁজে পেয়েছেন জামাই মিয়ার গোন্ডা কয়েক শ্বশুর বাড়ী। গাঁড়োলের সংখা কোন দিনই এক নয়, সর্বযুগেই একাধিক।

কন্যা তার আসন্ন প্রসবা। তাই হন্নে হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছেন আসকান মিয়া। এই অন্যায়ের প্রতিকার চান। কিন্তু কি প্রতিকার আছে এর। আসামী নিরুদ্দেশ, ঠিকানা অজ্ঞাত। মোকর্দমা করার কোন পথই নেই বলা সত্বেও আসকান মিয়া নাছোড় বান্দা। প্রতিকার একটা কিছু বাতলাতেই হবে আমাকে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, "প্রতিকার অবশ্য আছে একটা।"

শুনে আসকান মিয়া উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি সেটা বাবা শিগগির বাতাও।"

বললাম, আপনার মেয়ের যদি পুত্র সন্তান হয়, তাহলে তাকে মানুষ না বানিয়ে অমনি একটা ধুরন্দর খাদেম খতিব বানাবেন।

আসকান মিয়া এবার ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বললেন, তাতে লাভ ?

বললাম, "অনেক। তাতে জামাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে পারেন আর না পারে, নাতির দ্বারা আর পাঁচটা মেয়ের বাপকে পথে নামাতে আপনাকে একবিন্দুও বেগ পেতে হবে না।"

শুনে টান হয়ে শুয়ে পড়লেন আসকান মিয়া। আমি আমার শানদেয়া সাহিত্য চর্চার আগ্রহটাকে কান ধরে বিদেয় করলাম ভাবের বাগান থেকে। কাগজ কলম গুছিয়ে রেখে বাইরে এসে বসলাম। এলো মেলো অসংখ্য প্রশ্ন বোধক চিহ্নগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতেই উস্কো খুস্কো অবস্থায় পাশে এসে দাঁড়ালো এক পরিচিত যুবক। শহরের উপকণ্ঠেই বাড়ি। একটি নিতান্তই সৎছেলে। দক্ষ খেলোয়ার, সুন্দর অভিনেতা, নিঃস্বার্থ কর্মী। পাঁচজনের উপকারে সে বেগার খাটে সারাদিন। সবাই বলে এমন ছেলে হয়না। অভিনয় সূত্রেই আমার সাথে তার পরিচয়। সে একদিন এসে জানালো–সে ইলেকশান করতে চায়। ওয়ার্ড মেম্বরের ইলেকশান। আমি বললাম, খবরদার। সে বললো, কেন ? আমি বললাম, অভিনয় করার গন্ধ আছে যার গায়ে তার জন্য ইলেকশান হারাম।

সে তুষ্ট হয়নি আমার এই উপদেশে। গিয়েই সে নেমে পড়লো ইলেকশানে। এই কয়দিন হলো শেষ হয়েছে– ইলেকশান। আর কোন খোঁজ খবর রাখিনি। আজ তার চেহারা দেখেই অনুমান করলাম ফলাফল। তাকে বসতে দিয়ে তবু আমি বললাম, "কি খবর বলো, কংগ্রাচুলেশান জানাতে পারি নিশ্চয়ই ?"

সে ক্ষুন্ন কণ্ঠে বললো, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না স্যার। আপনার উপদেশ না শুনে যে ভুল আমি করেছি, এমনটি আর এ জীবনে হবে না।

–কেন, কেন ?

– আমি গো হারা হেরে গেছি স্যার।

– বলো কি। তবে, জিতলো কে ?

– হাজি সাহেব। সেই বোম্বাই হাজী– যার গপ্প একদিন আপনি আমার কাছে খুটিয়ে খুটিয়ে শুনলেন॥

– মানে।

– সেই যে কন্ট্রোলের গম চুরি আর রাস্তা করার টাকা মারার জন্যে জরিমানা হলো যার, সেই মেম্বর। ঐ ঘটনার পরেই তো উনি হজ্ব করতে যান। কিন্তু হজ্ব

বইঘর.কম ও রোকন

করলে হবে কি। চরিত্র তো বদলায়নি একটুও। ইসলামের মাথায় বাড়ি এরাই দিলো স্যার।

– আচ্ছা।

– চরিত্রটা যাই হোক, তবু তো হাজী। ঐ কিস্তি দিয়েই উনি বাজী মাৎ করলেন।

– কিন্তু তোমাকে তো যথেষ্ট ভালবাসতো লোকজন।

– দুঃখ তো আমার সেখানেই। খেস্টানী এলেমের বেদীন আদমী বোধে ইলেকশানে আমাকে বর্জন করলেন তারা। দেখলাম, আমার নাটক করার খবর ফলাও হয়ে সবার কানে পৌঁছে গেছে তার বার্তার মতো। আর ঐটেই হলো আমার কাল।

ছেলেটাকে উপদেশ দিয়েছিলাম আন্দাজে নয়, নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে। চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। মনের সেই প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলো মাথার মধ্যে ঢুকে কিলবিল করে ছুটতে লাগলো শুককীটের মতো। ভাবতে লাগলাম, আর কতদিন চলবে এই পুরানো ট্রাডিশান ? আজও কি তার শেষ হয়নি আয়ু ? আশরাফ উল মাখলুকাতের আসল পরিচয় কি ? মানুষকে মানুষ বলার ক্রাইটেরিয়ান কোনটা ? খোলসটাই বড় হবে মানুষটার চেয়ে ? মনের পবিত্রতা কি চিরকালই মার খাবে মোনাফেকীর হাতে। তাহলে ঈমানটা কি আর তার প্রয়োজনটাই বা কি ?

জীবনের প্রথম দিকের কথা। চাকরী বাকরী বাদ দিয়ে বাড়ীতেই বাস করছি দেখে, কিছু এলাকাবাসী ধরে বসলেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হতে হবে আমাকে। দেশসেবা মহৎ কাজ। আমার দ্বারা মহৎ কিছু সম্পন্ন হোক, এই তাদের দাবী। কেউ কেউ অবশ্য বললেন, না না, এতো লেখাপড়া শিখে এইভাবে লাইফটা স্পয়েল করা ঠিক নয়।" কিন্তু প্রস্তাবকারীদের যুক্তি আরো জোরদার। দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্র্যাসরুটলেভেল থেকে অর্থাৎ পল্লী থেকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার প্রয়োজন। নচেৎ, জাতির উন্নতি অসম্ভব। এই পল্লীর উন্নয়নে দেশের সেরা ব্রেন গুলোকেই আত্মনিয়োগ করতে হবে, দিতে হবে আত্মাহুতি। কেউ কেউ আরো জানালেন, সেই আত্মাহুতিটাও আবার নগন্য কাজ নয়- অনন্ত পূন্যের ব্যাপার, ধর্মযুদ্ধে শহীদ হওয়ার কাছাকাছি ঘটনা।

চোখের সামনে পৃথিবীটা তখনও রঙ্গিন। রক্তটাও গরম। তাই, আত্মত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা দেখানোর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। টপকে গেলাম। শুরু

হলো নির্বচনী লড়াই। প্রতিদ্বন্দ্বি একজন জুনিয়ার পাশ ব্যক্তি। ঝানু মাতবর ও পুরাতন চেয়ারম্যান। অনেক অভিযোগ তার বিরুদ্ধে লোকের। সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তার অখ্যাতির ঝড় বয় সবার মুখে। কিন্তু অনেকদিন মানুষ চরিয়েছেন চেয়ারম্যান সাহেব। মানুষের ঠোঁট ধরতে না পারলেও ভোট ধরার কায়দা উনি জানেন। কয়েকটা লম্বা পাঞ্জাবী দিয়ে তিনি কয়েকজনকে নামিয়ে দিলেন ক্যানভাসে। ব্যস ঐ লেবাস দিয়েই তিনি আমাকে ভাসিয়ে দিলেন বে-অফ বেঙ্গলে। তার সেই ক্যানভাসারেরা মহাবিপদ সংকেত ছড়িয়ে দিলো ইউনিয়নের সর্বত্র। হাক দিলো "হুশিয়ার হুশিয়ার, জাহান্নাম সন্নিকট। সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন বেরাদারানে জান্নাত।

ক্যানভাসারদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। মুসলমানের ছেলে হয়ে যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ায় বেদীন। রং বেরং এর সংসেজে রংঙ্গমঞ্চে নেচে বোড়ায় বে-শরা। গান বাজনার নাম শুনলে ফেরেস্তা যায় কয়েক ফার্লং ফারাগে। আর সেই নাফরমানী কাজ করে নাদান। তাকে ইউনিয়নের কর্তারূপে স্বীকার করে নিলে মহারোষে রুষ্ট হবেন ইষ্ট গুরু। সকলেই গোষ্ঠী সমেত জানান্নামে নিঃক্ষেপ করবেন পরমেশ্বর। আক্ষেপ করার অবসরটাও দেবেন না।

ব্যাস ড্যাম ডিফিট। জাহান্নামের ভয় করে না কে ? কোন কোন সেন্টারে মাইক্রস্কোপ লাগিয়েও আমার ব্যালট বাক্সের অভ্যন্তরে চিরকুটের একটা চিহ্নও পাওয়া গেল না। বুঝলাম, সংস্কৃতির সেবাটা জালিয়াতি রাহাজানীর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ। কারণ, ওসবের জন্যে কারো ইলেকশানে পাশ আটকায় না। আরো বুঝলাম, সংস্কৃতির সেবার একটা ফজিলতও আছে। সে কারণে সর্বাঙ্গে মল ছিটিয়ে দিলেও ভোটের বাক্স নির্মল রাখে পরকালদর্শী পাবলিকরা। এই ইলেকশান কারার ফলে আমাকে চিনে ফেললেন সকলে। যিনি জানতেন না তিনিও সত্যের চেয়ে দশগুণ অধিক জানলেন আমার নাফরমানী কীর্তিকলাপ। ফলে, জালসায় জামাতে মাহফিলে মসজিদে আমি হলাম সেট স্পীচ। আমার পরকালের ব্যাখ্যায় থুথুতে আস্তীর্ণ হলো মাইকের মাউথ পীচ।

ধ্যান ভাংগলো খোদাবক্সী বিস্ফোরণে। সে ভেতর থেকে তেড়িয়া কণ্ঠে আওয়াজ দিলোঃ "দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, তবু বসে বসে ঐ হাওয়া খেলেই চলবে ? খাওয়া দাওয়ার দরকার কিছু আছে না নেই, সেটা একেবারে বলে দিলেই তো বাঁচি। যত্ত মরণ হয়েছে আমার।

বইঘর.কম ও রোকন

# দশ

www.boighar.com

নাদিরাকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শেষ হয়েছে আমার। তার আশানুরূপ গতি হওয়ায় হাফ ছেড়েছে সে, স্বস্তির শ্বাস ফেলেছি আমি। বিধাতা তাকে রূপ দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু বিরূপ হয়ে হৃদয়বীণার সেই সুর যা পরাস্ত করে পাষন্ডকে, বিকল করে বৈরাগ্য চিত্তকে, বশে আনে বন্যকে– তা তাকে তিনি দেননি। মন মানসিকতায় নাদিরা আমিন অনেকটা যেন মীরজাফরের মনীবাঈ. শ্রীকান্তের পীয়ারী বাঈ নয়। তার পাশে আমিও একটা ভিন্নধর্মী অস্তিত্ব। কতকটা ঠিক ইস্ট ইজ ইস্ট, ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট ধরণের ব্যাপার।

নাদিরা আমিন চলে গেছে অপূর্ব অপেরায়। এক নজর দেখেই তাকে পছন্দ করেছেন রহমান সাহেব। নায়িকার পদ দিয়ে তাকে নিয়ে গেছেন অপূর্ব অপেরায়। মন মতো কাজ পেয়ে খুশী হয়েছে নাদিরা। পত্র পেয়ে জানলাম, মিঃ কে, আলম অপূর্ব অপেরার এক দূর্বার শুভাকাঙ্খি। নাদিরার অভিনয়ে অতিশয় তৃপ্ত হয়েছেন তিনি। তাঁরই অনুকম্পায় নাদিরা এখন অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করেছে সেখানে।

www.boighar.com

নাদিরা চলে গেছে। রয়ে গেছেন তার ভাই রুহুল আমিন সাহেব। বোনের সাথে নাট্যাঙ্গনে ঘুরে বেড়ানোর সখ তার আর নেই । খোদাবক্সের দোসর হয়ে আমার উপর খবরদারী করার ঝোঁকটাই তার এখন বড়। গোঁদের উপর বিষফোঁড়া। সঙ্গী পেয়ে সুবিধে হয়েছে খোদাবক্সের, আমার বেড়েছে বিপত্তি। এখন কোথাও পা বাড়াতেই বাঁধা আসে দু'দিক থেকে। হাতে বেশী কাজ না থাকায়, আমার শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ বিধানের অতি মহৎ কাজটি তিনি হাতে নিয়েছেন স্ব ইচ্ছায়। শুধুই কি তাই, ইদানিং আমার পরিণয় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই আমিন সাহেবের। কিন্তু আমার যে লেশমাত্র সাহস নেই এ ব্যাপারে তা তাকে বুঝায় কে ? নিজের ভার বইতেই যে সক্ষম নয় পুরোপুরি, অন্যের ভার সে গ্রহণ করবে কোন সাহসে!

অবশ্য শিশুকালে এ সাহসের আমার অভাব ছিল না। সালেহার মতো আর কত মেয়েকেই পাশে বসিয়ে বউ বানিয়েছি কতবার, বানিয়ে দিয়েছেন কতজন। দিনে দু'তিন বার এমন গ্রহণ বর্জ্জন নিয়ে বিন্দু মাত্র ভয় ছিলনা তখন। এমনটি হয়তো চলতেই পারতো আজীবন, যদি গোড়াতেই ধাক্কা খেয়ে ঘর পোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখে না শিখতাম ডরাতে। তখন সময়টা বর্ষাকাল। বয়স আমার বড়জোর সাত আট বছর। সেই সময় দাদির সাথে বেড়াতে যাই অনেক

দূরে। পুরো একদিন একরাত জার্নি করে হাজির হই দাদীর এক সই এর বাড়ী। পীরের মানত দিতে সেখানে যান দাদী। সেখানে থাকি আমরা কয়েকদিন। একদিন দেখি, ঘাটে বাধা পানশী নৌকা থেকে ঝপ করে পানিতে পড়ে গেল চোট্ট একটা মেয়ে। দেখলাম, সরাসরি তলিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। করণীয় স্থির করতে না পেরে আমিও ঝাপ দিলাম পানিতে। ধারণা ছিল, অল্প পানিই হবে বোধ হয়। কিন্তু মেয়েটিকে ধরার পর দেখি, তল পাচ্ছিনা পায়ে। বুঝলাম, আজরাইল ডাক দিয়েছে আমাকেও। আমার অপটু সাঁতার শক্তির সাহায্যে না পারলাম তুলে আনতে তাকে, না পারলাম তার আবেস্টন খুলে উঠে আসতে নিজে। জড়াজড়ি করে তলিয়ে গেলাম দু'জনই। তারপর আর কিছুক্ষণ খেয়াল নেই। খেয়াল যখন হলো তখন দেখি, অনেক মানুষ তুলে আনছে আমাদের। খেয়াল হতেই কে একজনকে বলতে শুনলাম, "ভাগ্যে ছেলেটাকে নামতে দেখলাম পানিতে। নইলে আমরা জানতেই পারতাম না কেউ। মরে ভেসে উঠতো মেয়েটা।" তারপর আমাকে নিয়ে সে কি মাতামাতি। সেকি আমার আদর যত্ন। মেয়েটাকে আমার পাশে বসিয়ে ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া হলো গল্প গুজব হলো। এক সময় মেয়েটাকে আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে দাদী হাসতে হাসতে বললেন, "নে, তোর বউ নে।" অচেনা বলেই হোক, আর অধিক কোল বদলের কারণেই হোক, কেঁদে ফেললো মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে কে একজন এসে হেচকাটানে আমার কোল থেকে তুলে নিলো মেয়েটাকে। খুব চোটপাট করে কথা বললো দাদীর সাথে। দাদীও এক হেচকাটানে আমাকে তুলে নিয়ে চলে এলেন ঐ বাড়ি থেকে। এর পর আর কি হলো তা মনে নেই। কিন্তু এতে বেজায় খারাপ হলো মনটা। ভড়কেও গেলাম অনেকখানি। আর কাউকে বউ বানিয়ে পাশে বসাবার সাহস পাইনি অতঃপর। সাহস পাইনা আজও।

মনে পড়ে আর একদিনের কথা। পাঠশালায় আমার সাথে পড়তো এক মেয়ে। নাম তার কস্তুরী। দুর্মতির বসে তাকে স্ত্রী সম্বোধন করায় সে নালিশ দিলো মাস্টারকে। মাস্টার মশাইতো তার করণীয় এমন সুচারু ভাবে সম্পন্ন করলেন যে, আমার পিঠে সারারাত তেল মালিশ করতে হলো আম্মাকে। ছোট বেলায় চাচার সাথে এক মেলাতে গিয়েও আমার বউ নেয়ার সাধ মিটেছে আর একবার। রং বেরংয়ের মাটির পুতুল দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ওগুলো কি?" কে একজন ঠাট্টা করে বললেন, "বউ"। অতপর 'বউ নেবো, বউ নেবো' বায়না ধরায় চাচা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিনে দিলেন বউ। কিন্ত কপাল আমার মন্দ। কয়েক ধাপ না এগুতেই হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল পুতুল আর চাচার হাতের চড়ে আমার গালে দাগ উঠে পাঁচ আঙ্গুলের।

বইঘর.কম ও রোকন

এর পর 'বউ' শব্দটি কানে পড়লেই অজান্তে চমকে উঠেছি দীর্ঘদিন। আজও যে সেই ভাবটা পুরোপুরি কেটেছে এমন বলা ঠিক নয়। হেনা এসে আচমকা হস্তক্ষেপ না করলে এ প্রসঙ্গের সাঙ্গ হতো গড্ডালিকা প্রবাহবৎ। আমার ব্রক্ষ্মাচারী হওয়ার পথ প্রশস্ত হতো দিন দিন।

নাদিরা চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর আজ বসে বসে এসব কথাই ভাবছি, এমন সময় খোদাবক্স চিঠি আনলো দুইখানা। লেখা দেখেই চিনতে পারলাম প্রেরকদের। একখানার লেখক রহমান সাহেব, অন্যখানা হেনার। বলাবহুল্য ক্ষীপ্র হস্তে হেনার চিঠিই খুলে ফেললাম প্রথম। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলালাম আগাগোড়া। বক্তব্য তার সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অনেক কথাই বলেছেন সে অল্প কথায়। হেনা চাকরী পেয়েছে পরীক্ষা দিয়েই। এখন সে এক মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা। তার ইচ্ছে ছিল আমার খোঁজে আমার এখানে আসার। কিন্তু সামনে বাধে পরীক্ষা। তারপর এই চাকরী। কাজেই এখন আমাকেই তার কাছে যাওয়ার জন্যে জোর তলব পাঠিয়েছে হেনা। তার খালুর বাড়ীর কাহিনীর শেষ পর্ব সম্বন্ধে সে লিখেছে "সেদিন বিকেলেই সবান্ধবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। সেজন্যে মাতাপিতার অনেক কটু কথা হজম করতে হয়েছে এই অপয়াকে।" চিঠির শেষ অংশে হেনা দুঃখ করে লিখেছে যে, আমি চলে আসার কিছুদিন পরেই আবদুল্লাহরা উঠে গেছে ঐ গ্রাম থেকে। কারণটা লেখেনি। সাক্ষাতে বলতে চেয়েছে। তার কাছে যাবার জন্যে আর একবার তাগিদ দিয়ে হেনা শেষ করেছে চিঠি।

আর একবার পড়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। আব্দুল্লাহদের খবরে অনেকখানি নষ্ট হলো হেনার চিঠির আনন্দ। রহমান সাহেবের চিঠিখানা আগাগোড়াই অভিযোগে পরিপূর্ণ। গড়িয়ে গেল অনেক দিন। চিঠি এলো, লোক এলো, রহমান সাহেব নিজে এলেন, অনেক জরুরী কাজ রেখে। তবু যাবো যাবো করে আমার আজ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি অপূর্ব অপেরার রিহেয়ারসেলে। এই তার শেষ তাগিদ। অতপর বন্ধু বিচ্ছেদের সমূহ সম্ভাবনা।

হেনার ঠিকানা মিলিয়ে দেখি, রাস্তা একই। হেনার সাথে সাক্ষাত করে অনায়াসেই যাওয়া যায় ঢাকাতে। সিদ্ধান্ত স্থির করে পরের দিনই উঠে বসলাম ঢাকা মেলে।

দিবারাত্র ছুটে হাজির হলাম হার ম্যাজেস্টির হোস্টেলে। বেলা তখন দশটা। দারোয়ানকে নাম বলতেই সে জানালো, কলেজে গেছে হেনা। আমি বললাম সেকি। আজতো বন্ধের দিন?

সে বললো, কি যেন একটা ফাংশান আছে কলেজে তাই একটু আগেই বেরিয়ে গেলেন আপামনি। ঐ যে কলেজটা ঐ সামনেই। যান ওখানে, নাম বললেই ডেকে দেবে।

তথাস্তু! গেলাম তার কলেজে। আয়না সাথে থাকলে চেহারাটা দেখে নিতে পারতাম। অবশ্য না থাকায় ভালই হলো। নিদ ঘুম বিবর্জিত একটানা জার্নির পর মহিলা কলেজের চত্বরে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে বদনের চেহারা দেখলে রোদনের উদ্রেকই হতে পারতো অধিক। গালে হাত দিয়ে দেখলাম, শুধু ধুলো বালিই নয়, হাতের তালুতে সদ্যকাটা উলু ক্ষেতের মতো আর কিছু খচ খচ করে ফুটছে। একবার ভাবলাম, না হয় ফিরেই যাই। এমন একটা ঝড়ের কাকের সাথে হেনাকে কথা বলতে দেখলে লোকে ভাববে কি। কিন্তু অধিক আর ভাবার সুযোগ পেলাম না। সদর ফটক খোলা থাকায় ঢুকে পড়েছি নির্বিঘ্নে। এবার হন হন করে ছুটে এলো গার্ড। বললো, কাকে চাই ? ইতস্ততঃ করে বললাম, হেনাকে।

– হেনা। কে হনা ?

– এখানকার অধ্যাপিকা।

– ঐ যে নতুন যিনি এসেছেন ?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, উনিই।

– আপনি ঐ ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন, আমি এখনি খবর দিচ্ছি।

পা বাড়িয়েই আবার ঘুরে দাঁড়ালো গার্ড। বললো, উনি কে হন আপনার ?

বিপদে পড়লাম। অল্প একটু চিন্তা করেই বললাম, সেটার কোন দরকার নেই। গিয়ে বলো, লোক এসেছে দেখা করতে। www.boighar.com

– ও, আচ্ছা – বলে চলে গেল গার্ড। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওয়েটিং রুমের বারান্দায়। এলো মেলো আসছে যাচ্ছে মেয়েরা। বর্তমানের কন্যা আর ভবিষ্যতের জায়া ও জননীরা। একটি মেয়ে কাছে এসে বললো, আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

বললাম, অধ্যাপিকা হেনার সঙ্গে।

সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলো, কে হন তার আপনি ?

মুসিবত বটে। কি উত্তর দেবো ভাবতেই ফিরে এলো গার্ড। বললো, হেনা আপা, প্রিন্সিপ্যাল আপার ঘরে আছেন। আপনার নাম বলতে না পারায় তিনি এলেন না। আপনাকেই যেতে বললেন সেখানে।

বইঘর.কম ও রোকন

লক্ষ্য করলাম, গার্ডের কথা শুনে সকৌতুকে হাসি চেপে চলে গেল মেয়েটা।

কি আর করি! এক পা, দুই পা করে হাজির হলাম অধ্যক্ষার দ্বারে। দ্বাররক্ষী অনুমতি নিয়ে এসে ছেড়ে দিলো দুয়ার। প্রবেশ করে দেখি, ঘর ভর্তি লোক, কিন্তু হেনা নেই সেখানে। চার পাঁচজন ছাত্রী, জনা আস্টেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও আমার পরিচিত এক যুবককে নিয়ে কি যেন আলোচনায় লিপ্ত আছেন অধ্যক্ষ সাহেবা। জনা কয় বাইরের লোকও ছিল সেখানে। আমার পরিচিত যুবকটির নাম অপু। অবশ্য তার ডাকনাম। সে এখন একজন সিভিল সার্ভিসের লোক। এই বছর খানেক হলো সে পেয়েছে এই চাকরী। আমি প্রবেশ করতেই প্রিন্সিপ্যাল সাহেবা প্রশ্ন করলেন, কি চান ? বললাম, আমি অধ্যাপিকা হেনার সাথে সাক্ষাত করতে চাই। শুনেই সাগ্রহে আমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগলেন সবাই। অধ্যক্ষ সাহেবা উৎসাহের সাথে বললেন, ও। আপনিই সেই লোক ? বসুন বসুন। হেনাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি এই নিকটেই। এক্ষুনি এসে পড়বে। আমি একটা চেয়ারে গিয়ে বসতেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, হেনা আপনার কে হয়?

আবার সেই প্রশ্ন। একটা রীতিমতো বিড়ম্বনা। হেনা আমার বোন নয়, আত্মীয় স্বজন কেউ নয়। শুধু পথের পরিচয় টুকুই মূলধন। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দুই নারীপুরুষের সম্পর্কের প্রশ্ন বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রশ্ন। পরস্পরকে বন্ধু বলে চালিয়ে নেয়া অন্য দেশে সহজ, এদেশে নয়। এ খবরে কবরে যাওয়ার মুহূর্তেও চোখকান খাড়া করে এদেশের মরারা। নিরুপায় হয়ে বললাম, একই অঞ্চলে বাড়ী, চেনা জানা লোক- এই আর কি।

এ জবাবে তুষ্ট হলেন না অধ্যক্ষ সাহেবা। নিতান্তই ঠান্ডা কণ্ঠে একটা 'ও' শব্দ করে উনি ফের মন দিলেন কাজে। উপেক্ষার সাথে চোখ ফেরালেন অন্যান্য সকলেই। অপু মিয়া আমাকে দেখেও না দেখার ভান করাতে আমিই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আরে তুমি মানে আপনি আমাদের অপু মিয়া নন। মানে আমাদের আদম সাহেবের ছেলে ? বিশ্বের বিস্ময় চোখে মুখে মেখে সে বিরক্ত হয়ে বললো, নামটা আমার অপু ঠিকই। কিন্তু আদম সাহেব। কে আদম সাহেব?

বললাম, সেকি। পার্বতিপুর রেলওয়ে জংশনের টালীক্লার্ক আদম সাহেব। আপনার ফাদার।

অপু মিয়া তা সরাসরি অস্বীকার করে বললো, কি বাজে বকছেন ? আমি আদম সাহেবের ছেলে নই। আমি কোন আদম সাহেবকে চিনি না।

হে সংজ্ঞা– বিলুপ্ত হও। বিস্ময়ের অথৈ সাগরে পড়ে গেলাম। বলে কি। আমি পার্বতিপুরে ছিলাম কিছুদিন। তখন ওর আব্বাই ওকে এনে পরিচয় করিয়ে দেন আমার সাথে এরপর ও নিজেই বেশ কয়েকবার গিয়েছে আমার ঐ পার্বতিপুরের আস্তানায়। চা খেয়েছে, গল্প করেছে। আমার আসার দিন অপু নিজেই আমাকে উঠিয়ে দেয় ট্রেনে। এমনতো কয়েক যুগ আগের কথা নয় যে, এতবড় ভুল হবে আমার। বিস্মিতকণ্ঠে বললাম, বলেন কি। এও সম্ভব।

এবার অসহিষ্ণু কণ্ঠে অপুমিয়া বললো, কি সম্ভব অসম্ভব তা আপনার ব্যাপার। আমিতো বলছিই, ঐ আদম টাদম কোন কাউকে চিনিনা। তবু কেন বিরক্ত করছেন ?

সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে তাকে সমর্থন দিলেন উপস্থিত সকলে। তারা আক্রমাণাত্মক কণ্ঠে বলতে লাগলেন, উনি আমাদের নতুন হাকিম, ফালতু লোক নন। উনি বলছেন, – ঐসব আদম টাদম কাউকে চেনেন না, তবু আপনি এরকম জিদ করছেন কেন ? কাকে না কাকে ভেবে কাকে কি বলছেন ?

অলক্ষ্যে কে একজন বললেন, মাথায় ছিট টিট আছে নাকি।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো বিদ্রুপের চাপাহাসি। মহিলারা প্রত্যেকেই আচল দিলেন মুখে। বিতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে চেয়েই আবার চোখ ফেরালেন অধ্যক্ষা সাহেবা।

পরিস্থিতি এমনই হয়ে দাঁড়ালো যে, সেই মুহুর্তে যদি মাটি ফেটে দুই ভাগ হতো একমাত্র তাহলেই তার মধ্যে মুখ লুকিয়ে এ জিল্লতি এড়ানো সম্ভব ছিল আমার। মাথা নীচু করে চুপ চাপ বসে রইলাম বটে, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্ত শতাব্দির দুর্বিসহ দোযখ যন্ত্রনার চেয়েও অসহ্য মনে হলো আমার। নির্লজ্জতা এ জীবনে ভুরিভুরি দেখেছি। কিন্তু এমনটি নজীরহীন। এটি আরো অনন্য হয়ে উঠলো যখন আলোচনার একফাকে উপস্থিত সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের শুনিয়ে শুনিয়ে অপুমিয়া বলতে লাগলো, আমাদের ফ্যামিলীতে ইংরেজী ছাড়া বাংলা বড় একটা চলেই না। আর চলবেই বা কি করে। আমার আব্বা আম্মা কেউ তো আর ক্ষেত খামারের অর্ডিনারী লোক নন। আমার আম্মা ইংরেজী আর ফিলোসফি দু'টোতেই এম এ, এবং দু'টোতেই ফাষ্ট ক্লাশ ফাষ্ট। আমার আব্বা আলী গড়ের ট্রিপল এম এ, এবং তিনটিতেই গোল্ড মেডালিস্ট।

জনৈক অধ্যাপক বললেন, "শর্ট কোর্স হলেও, এই চাকরীর পরীক্ষায় আপনিও নাকি ভাল রেজাল্ট করেছেন ?"

বইঘর.কম ও রোকন

গর্বে ফুল উঠে অপুমিয়া বললো, "ভাল রেজাল্ট মানে ? ফার্ষ্ট হয়েছি আমি।"

শুনে পার্শ্বে দণ্ডায়মানা এক ছাত্রী অবাক হয়ে বলালে,"সেকি! ফার্স্ট হয়েছেন তো আমার দুলাভাই। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড-এদের সবাইকে আমি চিনি। এ ছাড়া রেজাল্টের কাগজটা আমার কাছে আছে।"

অন্য কেউ হলে এরপর দড়ি দিতো গলায়। কিন্ত অপুমিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললো, "তাই নাকি! আমার রোল নাম্বারটা মনে নেই। তাহলে মিলিয়ে দেখতে হবে।"

এ জবাবে অন্যে কে কি মনে করলেন জানিনা। আমার মনে হলো, ওটি মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হলে আশরাফ-উল মাখলুকাতের মুখে এ মুহূর্ত্তে এত রাশি রাশি কালীর পোজ পড়তো না। এমন জাজ্জিল্যমান মিথ্যাচারে লজ্জা হয় না যার, মানুষ বলে নিজেকে দাবী করার তার অধিকার নেই একতিল। তদুপরি, নিজের বাপকে যে বাপ বলে স্বীকার করতে চায়না, শুধু পাষন্ড বললেই তার সম্বন্ধে শেষ হয় না বক্তব্য। নিজের বাপ না হলে তার অর্থ যা দাঁড়ায় তা কদর্য! অথচ, অপুর বাপ আদম আলী মোটামোটি ভালই মানুষ। তার সাথে পরিচয় আমার বাল্যকালে। হরিরামপুরের তাহেরা ওরফে টেপীর সাথে নন-ম্যাট্রিক আদম ভাইয়ের বিয়ে হওয়ার প্রায় এক যুগ পরে আমি হরিরামপুরে কিছুদিন অবস্থান করি পাঠ্যাবস্থায়। আদম ভাইকে 'দুলাভাই' সম্বোধন করায় প্রায় চাচার বয়সী আদম ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা জমে উঠে সেখানেই। দিনে দিনে সে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠতর হয়। সেই আদম ভাই আলী গড়ের টিপল এম,এ, আর হরিরামপুরের টেপী হলো ইংরেজী আর ফিলোসফিতে ফাস্ট্ ক্লাস ফার্ষ্ট! হরিহে, পাপী তরাও!

এ প্রসঙ্গ আমি হয়তো ভুলেই যেতাম অল্পদিনে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় আবার আমার আস্তানায় হাজির হয়ে বেহুদাপনার যে নিদর্শন অপু আমার স্মৃতিপটে খোদাই করে রেখে গেল, খোদা জানে, এ জনমে তা ভুলে যাওযা সম্ভব কিনা আদৌ। আমার কাছে এসেই সে নির্দ্বিধায় বললো,"মামা, খোদার কছম, তখন আমার চোখ দিয়ে অবিরাম পানি ঝরছিলো বলে ভাল করে চিনতে পারিনি আপনাকে। ও নিয়ে আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার আব্বা-আম্মার পরিচয়টা আমাদের মধ্যেই থাক। বিটুইন ইউ এ্যান্ড মি। ওটা আপনি কাইন্ডলী কাউকে বলবেন না। আমি এসেছি -একটা উপকার আপনাকে করতে হবে মামা-। অধ্যাপিকা হেনা দেখলাম আপনার খুব ভক্ত। যেভাবেই হোক, ওর সাথে আমার একটা লাইন-মানে যোগাযোগ করে দিতেই হবে মামা! ফর গড্স্ সেক্!"

বইঘর.কম ও রোকন

নেহাতই একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইনি বলে পারিনি, নইলে সেই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে হয়েছিল সবলে ওর নাকে একটা ঘুষি মেরে ওর মনটার মতো মুখটাকেও কুৎসিত করে দিই।

শুধু এই একজনের কথাই বা বলি কেন ? এমন নজীর এদেশে সীমিত নয়। পদস্থ ব্যাক্তিদের বেহুদাপনার যত কথা জমা হয়ে আছে আমার স্মৃতির পাতায়, সবিস্তারে বললে তা দিয়ে একটা দীর্ঘকায় উপাখ্যান তৈরী করা যায় অনায়াসে। তাই ভাবি, সুদীর্ঘ বছর ধরে এরা কি শুধু ঘাসই কেটে গেছে পাঠশালায় ? মাষ্টার মশাইরা গাধা পিটে মানুষ বানাতেন যেখানে, সেখানে এতদিন থাকা সত্বেও ফুল মানুষ না হোক, এরা হাফ মানুষও হতে পারেনি কি কারণে ? নাকি এরা একবারেই গোত্রহীন ? আমের জায়গায় আমড়াও নয়—একেবারেই কচু ঘেচু ?

www.boighar.com

থাক সে কথা। মাথামুন্ড হেট করে কতক্ষণ যে বসেছিলাম অধ্যক্ষার কক্ষে তা খেয়াল নেই। খেয়াল হলো হেনার কন্ঠস্বর কানে যেতেই কক্ষে ঢুকে আমার উপর নজর পড়তেই হেনা উচ্ছসিত কণ্ঠ বলে উঠলো, "আরে "আপনি! সেকি! আপনি এসে বসে আছেন ওয়েটিং রুমে! ছি-ছি ! "আমি ভাবলাম কে-না কে ? নামটা আপনার বলতে হয় না খবর দেয়ার সময় ? "

হেনার এই উৎসাহে সকলের বিস্মিতদৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হলো পুনরায়। অন্য কথায় বলা যায়, আবার বৃদ্ধি পেল মূল্য আমার। জনৈক অধ্যপিকা হেনাকে প্রশ্ন করলেন, "কে রে হেনা ? খুবই পরিচিত জন বুঝি ?" হেনা হাসতে হাসতে উত্তর দিলো, "খুবই"।

এরপর হেনা অধ্যক্ষাকে লক্ষ্য করে বললো, "আপা যে কাজে গিয়েছিলাম, সেটা কমপ্লীট। এবার আমি যাই আপা ? অনেক দূর থেকে এসেছেন উনি" আমার প্রতি ইঙ্গিত করলো হেনা।

অধ্যক্ষ সাহেবা স্মিতহাস্যে বললেন, "ভদ্রলোকের পরিচয় তো দিলে না ?"

উত্তরে হেনা বললো, "খুবই আপনজন আপা। আমাদের ঐ অঞ্চলেই বাড়ী। যেমন পন্ডিত, তেমনি খেয়ালী। একে নিয়ে এক দায় হয়েছে আমার।"

খুশীর আধিক্যে বলে গেল হেনা। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারতো এতে শ্রোতাদের শিরা উপশিরায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সাপ্লাই করলো সে।

অধ্যক্ষা নবীণা নন, প্রবীণা। তিনি কি মনে করলেন জানিনা। ভ্রুকুঞ্চনে বুঝলাম, অনুভূতি সকলেরই এক। প্রভেদটা শুধু তার প্রকাশের বেলায়। তিনি স্মিতহাস্যে বললেন, "আচ্ছা এসো। উনার যদি থাকার প্রশ্ন থাকে, তাহলে

বইঘর.কম ও রোকন

ডাকবাংলায় লোক পাঠিয়ে দিও সকাল সকাল। নইলে হয়তো সিট পাবেনা অবেলায়।”

একটা পিওন ডেকে ডাকবাংলায় পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে ষ্টাফরুমে প্রবেশ করলো হেনা। কলেজ বন্ধ। ষ্টাফরুম ফাকা। শুধু একজন আয়া বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো বারান্দায়। তাকে চা আনতে বলে দিয়ে হেনা এসে বসলো আমার পাশে। বললো, “চিঠি পত্রের উত্তর লেখারই অভ্যাস নেই যার সে সত্যি সত্যিই এসে হাজির হবে এখানে, এটা আমি কেমন করে বিশ্বাস করি বলুন তো!”

বললাম, “কেন, তাকিদটাতো আর যেমন তেমন পাঠান নি! একদম ওয়ারেন্ট অব এ্যারেষ্ট!”

–তাই বুঝি ? ভাল। তবু যে বুঝতে পেরেছেন সেটা, এই ঢের!

–ব্যাপারটা কি বলুন তো!

–ব্যাপার! কিসের ব্যাপার ?

–এতো তোড়জোর করে ড়েকে পাঠানোর ?

–কিছু নয়, এমনি!

–এমনি! বলেন কি!

–কেন, দোষ করেছি কিছু ?

–মানে, স্রেফ অকারণেই ডেকে পাঠালেন এত দূর ? জার্নিটা কি কষ্টের তা জানেন তো ?

–জানি। তাছাড়া আপনার চেহারা দেখেও বুঝতে পারছি। কিন্তু ও নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই।

–মানে!

–রাস্তা ঘাটে এ রকম কষ্ট করায় আপনি তো বরাবরই অভ্যস্ত! হরহামেশাই পথের কষ্ট ভোগ করেন অকারণে। আমার খাতিরে আর একদিন না হয় করলেনই একটু। এ আর এমন কি ?

–আপনি কি পরিহাস করার জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে ?

– যে কারণে ডেকেছি, সেটা এখন নয়, পরে।

–পরে। বেশ তাই হোক। কিন্ত আব্দুল্লাহদের খবর কি বলুন! খবরটা পাওয়ার পর থেকেই মন আমার খুব খারাপ।

বইঘর.কম ও রোকন

ইতিমধ্যে চা নাস্তা হাতে নিয়ে হাজির হলো আয়া। হেনা বললো "ওটাও পরে। আর কোন কথা নয়, এবার মুখে দিন এগুলো।"

চা-নাস্তা সারতেই পিয়ন এসে জানালো, ডাকবাংলায় সিট্ রেডি। গোছলের পানি থেকে শুরু করে সব কিছুই প্রস্তুত। আমাকে উঠতে ইঙ্গিত করে হেনা বললো।, "চলুন, আগে গোছল–আহার বিশ্রাম -তারপর অন্য কথা"

ক্লান্তিবোধ করছিলাম আমি নিজেও। তাই দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে পড়লাম ডাক বাংলার উদ্দেশ্যে। ডাক বাংলোটি কলেজের মোটামুটি পাশেই। সেখানে পৌঁছে দেখি-তিন কামরাবিশিষ্ট ডাকবাংলার দু'টি কামারায় লোক আছে আগে থেকেই । তিন নং কামরাটিতে আমাকে তুলে দিয়ে, আহারাদির ব্যাপারটা চৌকিদারকে সমঝে দিয়ে পিয়নের সাথে চলে গেল হেনা। বলে গেল, বিকেলে সে আসবে আবার চারটের দিকে। সব কথা তখন।

বিকেলে ঘুম ভাঙ্গতেই কড়ানাড়ার শব্দ হলো দরজায়। খুলে দেখি, আয়ার সাথে হেনা। হেনাকে বসতে বলে চোখ মুখ ধুয়ে ফ্রেশআপ হয়ে আসতেই, আয়ার সাথে চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো চৌকিদার। আয়াও চৌকিদার দু'জনই চলে গেল চা দিয়ে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, "এবার বলুন, সত্যি সত্যি কি জন্যে তলব করেছেন আমাকে।"

স্মিতহাস্যে হেনা বললো, "বললামই তো, আপনাকে পথে নামানোর জন্যে । ঘর সংসারে মন যখন নেই আপনার-"

বললাম,"কে বললে ঘর সংসারে মন নেই আমার ?"

–আপনিই তো বলেছিলেন একদিন। আর তাছাড়া বলতে হবে কেন? আপনার স্বভাব দেখেই তো বুঝা যায় –আপনি আজন্মের যাযাবর। ঘর সংসার মন থাকলে ওভাবে পথে পথে না ঘুরে একটা নির্দ্দিষ্ট জীবিকা অবশ্যই বেছে নিতেন এতদিন।

–কি রকম ?

–নির্দ্দিষ্ট কোন একটা কাজ থাকতো আপনার।

নির্দ্দিষ্ট! কিন্তু সেটা আমায় দিচ্ছে কে ?

–আমি দিতে পারি।

–পারেন ?

বইঘর.কম ও রোকন

–অবশ্যই।

–কি কাজ দিতে পারেন ?

–কি কাজ

একটু দম ধরে হেনা আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো। তার কণ্ঠস্বরে বুঝলাম, রসিকতার পর্যায়ে আর পড়ে না এ কণ্ঠ। বললো "আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবেন ?

বললাম, "কি কথা ?"

বললো,"আপনার শিক্ষাদীক্ষা সত্যিকারের কতখানি ?"

বুঝলাম হেনা কি বলতে চায়। সে জানতে চায় আমার ডিগ্রী। কিন্তু সালেহার কাছে আগেই সে জেনেছে–আমি হাই স্কুলই উৎরাইনি। তাই আমি লজ্জা পাবো ভয়ে সে আর তা স্পষ্ট করে যাচাই করতে পারছে না। সুযোগ পেয়ে আমিও সদ্ব্যবহার করলাম তার। বললাম, "শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্ন উঠলে আমি কাত। কারণ ওটি আমার সামান্যই।"

দমে গেল হেনা। বললো, "কিন্তু আপনার যা জ্ঞান গরিমা, তাতে উচ্চ শিক্ষা পাননি আপনি, এটা ভাবা কঠিন।"

প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে বললাম, "কেন বলুনতো? আপনার ঐ কাজের জন্য বুঝি খুবই ডিগ্রীধারী লোক চাই ?"

আমাকে উৎসাহিত রাখার জন্যে হেনা ব্যস্ত কণ্ঠ বললো,"না-না, ডিগ্রীর প্রয়োজন তেমন একটা নেই-ই। যা দরকার তাহলো জ্ঞান গম্মি আর একটু গুছিয়ে বলার ক্ষমতা । ওটা আপনার ঢের আছে।"

বললাম, " কি কাজটা কি ?

–কাগজের সহকারী এডিটার। একটা কাগজ বের হচ্ছে ঢাকা থেকে। যিনি বের করছেন তার বাড়ী এখানে। প্রবীন মানুষ, ধনাঢ্য ব্যক্তি। পয়সার জন্যে তার কোন ঠেকা নেই। তিনি চান, জ্ঞানী -গুণী আর সংস্কৃতিমনা লোক। আমি আপনার সম্বন্ধে তাকে বলায়, তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আপনাকে ডেকে আনার জন্যে খুবই তাকিদ দিচ্ছেন আমাকে। মোটা মাইনে দেবেন।"

–ও, তাহলে ইন্টারভিউ দিতে ডেকে এনেছেন আমাকে ?

– না-না, আপনি রাজী হলেই উনি দিয়ে দেবেন চাকরী। নিতান্তই কাজ না হলে সে কথা পরে। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি– শুধু কাজই হবে না

বইঘর.কম ও রোকন

আপনাকে দিয়ে, আপনি আশাতীত নাম করবেন এ কাজে।”

–তাই নাকি ?

–এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। প্লীজ বলুন, রাজী আছেন আপনি, রাজী থাকলে আজই নিয়ে দেবো এ্যাপয়েন্টমেন্ট্।

–সে তো হলো। কিন্তু আমাকে চাকরী দেয়ার ব্যাপারে আপনার এত আগ্রহ কেন বলুন তো ?

–কেন তা জানিনে। তবে সাফ কথা–ছন্নছাড়া হয়ে আর ঘুরে বেড়ানো চলবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে আপনাকে। দশের মাঝে মাথা উঁচু করে চলতেই হবে আপনাকে।

একটা অপরিসীম আগ্রহ ঝরে পড়লো হেনার কণ্ঠ থেকে। বললাম, “তাহলে আপনি খুশী হবেন ?”

সে বললো, “সীমাহীন খুশী হবো। আপনার পরিচয় যে দিন বুক ফুলিয়ে দিতে পারবো দশজনের মাঝে, সেদিন আমার চেয়ে খুশী কেউ আর থাকবে না। বলুন রাজী ?”

বললাম, “আপনার কথা ফেলতে পারি আমি ? তবে একটু ভেবে দেখতে হবে। হুড়মুড় করে কাউকে কোন কথা দেয়া ঠিক নয়।”

এ কথায় হেনার উৎসাহ কমে গেল খানিকটা। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো, “বেশ। তাহলে ভেবেই দেখুন । তবে জবাবটা চাই কিন্তু সত্বর!”

বললাম, “ঠিক আছে। দু’তিন দিনের মধ্যেই আমি আমার মতামত জানাবো।”

– দু’তিন দিন! কেন, আজকে তা পারেন না ?

– একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে তো! আজ “হ্যাঁ” কাল “না” করাটা কি ভাল ?

একটা অস্পষ্ট বেদনার ছাপে মলিন হলো হেনার মুখ মন্ডল। অনেকক্ষণ দম ধরে থেকে সে বললো, “আচ্ছা, তাই জানাবেন।”

ফাঁক পেয়ে আমি ফস করে বললাম, “এবার বলুনতো আব্দুল্লাহদের খবর কি?’

হেনা তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছিল। আমার প্রশ্নে ধ্যান ভঙ্গ হওয়াতে সে বললো, ” কি বললেন ?”

বললাম,”আব্দুল্লাহদের কথা। ওরা ওখান থেকে উঠে গেল কি কারণে ?

বইঘর.কম ও রোকন

হেনার মুখমন্ডল বিষন্ন হলো আবার। বললো, "কারণটা খুবই করুণ। আব্দুল্লাহ সাহেবের অনুপস্থিতিতে পর পর কয়েকবার হামলা হয় সালেহা আপার উপর। হামলাকারীরা ঐ গ্রামেরই লোক। শরীয়ত বিরোধী পরিবার বলে গ্রামের ময়-মুরুব্বীরা অনেকেই পরোক্ষভাবে মদদ দেয় হামলাকারীদের। কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যেও উস্কানী দেয় তাদের। আমার খালু হস্তক্ষেপ করাতেও ফল হয় না তেমন। গ্রামের এক বিত্তবান মাতব্বরের নজর পড়ে সালেহা আপার উপর। আব্দুল্লাহ সাহেবকে ডেকে তালাক দিয়ে নিকাহ করার পরামর্শ দেয় সালেহা আপাকে সে। এতে সালেহা আপা ঐ মাতব্বরকে অপমান করায় শুরু হয় এই হামলা। শেষ হামলায় সালেহা আপাকে অপহরণ করে নৌকার উপর তুলেই ফেলেছিল দুর্বৃত্তেরা। হঠাৎ লোকজন এসে পড়ায় বেঁচে যান তিনি। আবদুল্লাহ সাহেবের দলের কাজ তখন শুরু হয়েছে পুরোপুরি। কোন মতে আব্দুল্লাহ সাহেব এসে নিরুপায় হয়ে সালেহাকে পাঠিয়ে দেন তার বাপের বাড়ী। ওখানকার বাড়ী ঘরও বেঁচে দেন সাথে সাথেই।"

রুদ্ধশ্বাসে শুনে গেলাম আব্দুল্লাহর কাহিনী। আমাদের সমাজের দূরাবস্থার দরুণ মনে প্রচন্ড আঘাত পেলাম আর একবার। ক্ষণিক নীরব থেকে বললাম, "এ খবর কবে পেলেন আপনি?"

হেনা বললো, "কয়েক মাস আগে। আমার বান্ধবী লতিফাকে মনে আছে তো? তারই কাছে শুনেছি এ ঘটনা। বাড়ী ঘরের ন্যায্য মূল্যটাও নাকি তাদের পেতে দেয়নি গ্রামের ঐ দুর্বৃত্তেরা।"

আব্দুল্লাহকে খুঁজে পাওয়ার কোন সূত্র নেই আপাততঃ। এদিকে অপূর্ব অপেরার তাকিদও আমার চরম। তাই ভাবলাম, ঢাকা থেকে ফিরে, কাজকাম গুছিয়ে নিয়ে খুঁজতে বেরুবো আব্দুল্লাহদের। যদি পাই এবং যদি তারা রাজি হয়, তাদের আমি আমার বাড়ীতেই তুলবো এনে।

কোন মতে হেনাকে বুঝিয়ে আমি খাটো করলাম সেখানকার প্রোগ্রাম। দু'একদিনের মধ্যে ফিরেই চাকরীর ব্যাপারে আমার মতামত জানিয়ে যাবো ওয়াদা করে, পরের দিন ভোরেই রওয়ানা হলাম ঢাকার পথে।

# এগার

ঢাকা পৌঁছে দেখা গেল, সেখানে আমার বেশ কিছু দিন থাকবার দরকার। দু'একদিনের কাজ নয়। যাত্রাপালা 'রাজপুত্র' মঞ্চে তোলার ব্যাপারে সকলের জান ঝালাপালা করেছেন রহমান সাহেব, তবুও সে পালাটি মঞ্চে তোলা যাচ্ছে

বইঘর.কম ও রোকন

না। কারণ, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় সাধন করে জগন্ময়মিত্রের কণ্ঠ আর শিশির ভাদুরীর টেকনিক রপ্ত করতে পারছেন না পাকাপোক্ত নায়ক। একটা আবেগময় কণ্ঠ দেয়ার পর মনোলগের ম্যাস্‌কিউলিন্‌নেস্‌ আর থাকছে না। হয় অসুর কণ্ঠে সুর দিয়ে নাকি সুরে আওড়াচ্ছেন অমিত্রাক্ষর ডায়ালগ, নয় নাকি সুরে গান গেয়ে দৈত্যবত চীৎকার করছেন অযথা। অনেক ক্ষেত্রে আবার বিশুদ্ধ চলতি ভাষার ঘাড়েও চাপিয়ে দিচ্ছেন মাইকেলী ইমোশান।

অবশ্য কাজটা বেশ শক্ত। সিনেমার প্লেব্যাকের ফাঁকিবাজি মুক্ত মঞ্চে নেই। স্ব-স্ব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অতীতের অমিত্রাক্ষর আর বর্তমানের ওকালতি আর্গুমেন্টের সাথে কল্লোলে যুগের সুরারোপ কঠিন কাজ। লেখার সময় যে মুডে লিখেছি –সেই অরিজিন্যাল টেম্পো মনে আনতে না পারলে এই সমন্বয় দুঃসাধ্য। অন্যে এটা আন্দাজ করবে কি করে? www.boighar.com

অগত্যা নিজেকেই নামতে হলো মোহড়ায়। নায়ককে দেখাতে গিয়ে নিজেকেই সাজতে হলো নায়ক। আমাকে হাতে পেয়ে গোটা আকাশটাই হাতে পেলেন রহমান সাহেব। অপূর্ব জীববৎ উনি আমাকে অপূর্ব অপেরায় কাছি দিয়ে বেঁধে রাখলেন কিছু দিন। কোন ওজর আপত্তি মানলেন না। খেই পেয়ে নাদিরাও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো নায়িকার ভূমিকায়। নায়িকা হিসাবেও তার অবদান অপূর্ব। হৈ হৈ করে প্রায় মাসখানেক ধরে চললো এই মহড়া।

পরিস্থিতি আঁচ করে ঢাকায় পোঁছার পরের দিনই আমার জবাবটা পাঠিয়ে দিলাম হেনাকে। ঠিক জবাব নয়, অনেকটা এ্যাপোলোজি। লিখলামঃ

আপনার আন্তরিকতা কোন দিনই ভুলবো না। এমনটি আর কোন দিন পাইনিতো তাই। বিশেষ কাজে আটকে গেছি বলেই চিঠি লিখে জানাচ্ছি। সালেহার কাছে আপনি যা শুনেছেন তার সবটুকু সত্য নয়। জীবিকা আমারও আছে একটা। অবশ্য তা চাকুরী নয়। ওটি আমি পারিনে। দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি বিশ্বাস করি আমার কষ্ট হোক, এমনটি নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না।"

চিঠিটা ছেড়ে দিয়ে ভয়ে ভয়েই ছিলাম। যথা সময়ে চলে এলো উত্তর। হেনা লিখলোঃ

"জবাবটা যে এমনি হবে, ওটা আমি বুঝে নিয়েছি সেদিনই। এতে আমার নতুন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আপনি আসবেন আবার সময় করে।"

বইঘর.কম ও রোকন

মনটা হালকা হলো অনেকখানি। এবার কোমর বেঁধে লেগে গেলাম মহড়ায়। অখন্ড তৎপরতায় তৈরী হলো নাটক। অধিক কাল গত হওয়ায় কেন যেন ঘরে ফেরার তাগিদে বেশখানিকটা উতলা হলো মন। তাই মহড়ার শেষের দিকে দলের নায়ককে তালিম দিলাম শক্ত করে। অতঃপর আর কালক্ষয়ের অক্ষমতা ব্যক্ত করে ছিন্ন করলাম রহমান সাহেবের আতিথেয়তার বন্ধন। কিন্তু তাহলে কি হয়! আগ্রহ যেখানে অধিক, বিপত্তি সেখানে বিস্তর। হেনার কাছেও না গিয়ে সরাসরি বাড়ি ফেরার কালে পড়ে গেলাম এক পাগলা আত্মীয়ের পাল্লায়। ওয়ারিশদের গ্রাস থেকে তার বিষয়বিত্ত রক্ষে করে দিতে গেল আরো দশ বারোদিন। হিসেব করে দেখলাম, সাকুল্যে গড়িয়ে গেছে দেড় মাস।

মানুষের মনটাই নাকি একটা মিনি সাইজ পতেঙ্গা। অনাগত অনেক কিছুই উঁকি মারে সেখানে। এ প্রত্যয় আমার দৃঢ় হলো প্রত্যাবর্তন করেই। গৃহে ফিরে দেখি, গৃহ আমার হাসপাতাল। খোদাবক্সের জ্বর। আমিন সাহেব অত্যধিক অসুস্থ। কাজ করার মেয়েটাও লেপকাথা মুড়ি দিয়ে অবিরাম কোকাচ্ছে সর্দ্দি কাশীর আক্রমণে। মাস ধরে মোহড়ার পর ঘরে ফিরে যে ভূমিকা ঘাড়ে তুলে নিলাম, তা নায়কের নয়, নার্সের। লেগে গেলাম আর্তজনের সেবায়। দীর্ঘকাল সেবা নিয়েছি এদের, এবার কিঞ্চিত পরিশোধের মওকা পেয়ে খুশীই হলাম মনে মনে। শুরু হলো সাবু করা, বার্লি করা, পথ্য করা, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এবং এক একজনের এক এক রকম আনুষাঙ্গিক পরিচর্য্যা। এভাবে একটাদিন না যেতেই বুঝলাম, আর্তের সেবা শব্দটা বলতে যত জুত্ কাজের বেলায় জুতসই নয় ততখানি। হাঁপিয়ে উঠলাম অল্পতেই। অল্পতেই অধিক পয়সার বিনিময়ে হায়্যার করে আনতে হলো ছোট বড়-মাঝারী-হরেক রকম সেবক ও সেবিকাদের। সকলের সমবেত চেষ্টায় খোদাবক্স ও কাজ করা ঝি-টা উঠে বসলো একদিনেই।

কিন্তু উঠলো না না রুহুল আমিন সাহেব। তিনি ছটফট করতে লাগলেন অবিরাম। তাঁর অবস্থার অতিদ্রুত অবনতি দেখে তাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেলাম হাসপাতালে। পরীক্ষান্তে ডাক্তার যা জানালেন তা মর্ম্মান্তিক। তিনি বললেন, "আর বেশি আশা নেই। রোগটা এ্যাপেন্ডিসাইটিস্। ওটা পেকে ফেটে গেছে ভেতরে। এখন যে কোন সময় এক্স্পায়ার করতে পারে রোগী।

শুনে চমকে উঠলাম। বললাম, "এ্যা! একসপ্যায়ার। ডাক্তার বললেন, ইট ইজ টুউ লেট! আমাদের আর বেশি কিছু করার নেই।"

বইঘর.কম ও রোকন

ব্যস্ত হয়ে বললাম, তবে কি গতকাল আনতে হতো রুগীকে ? ডাক্তার বললেন, না , ওতে কোন ফল হতো না। কমপক্ষে সপ্তাহখানেক আগে আনলে অনেক কিছু করা যেতো।

আমি ঘরে ফিরেছি গত পরশু। আমি তাকে একসপ্তাহ আগে আনবো এ প্রশ্নই উঠে না। খোদাবক্স সুস্থ থাকলে হয়তো একটা কিছু করতে পারতো সে।

থপ করে বসে পড়লাম পাশের একটা চেয়ারে! বন বন করে ঘুরতে লাগলো মাথা। এঁকি নিদারুণ পরিণতি ঘটতে যাচ্ছে চিরভাগ্যহীন এই রুহুল আমিন সাহেবের! চিকিৎসার সুযোগটাও সে পেলো না। আমি ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম, "ডাক্তার সাহেব, যত টাকা লাগে আমি দেব, দোহাই আপনাদের, যেভাবে হোক, আপনারা সবাই মিলে বাঁচিয়ে তুলুন তাকে।

ডাক্তার সাহেব বললেন, চেষ্টার ক্রটি আমারা করবো না কিন্তু অপারেশন এখন অর্থহীন একমাত্র কন্‌জারভেটিভ ট্রিটমেন্টই এখন অবলম্বন। দেখা যাক বেচারার ভাগ্য!

রহমান সাহেব আর নাদিরাকে জরুরী তার পাঠিয়ে সারারাত পড়ে রাইলাম হাসপাতালে। লেগে রইলাম ডাক্তারদের পেছনে। কিন্তু ব্যর্থ হলো সব। ভাগ্য তার নির্দ্ধারণ হয়ে গেলো শিগগিরই। পরের দিন সন্ধ্যা বেলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আমিন সাহেব! (ইন্না লিল্লাহে...............)

নির্বাক হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম, এ বিশ্বে পাঠিয়ে তাকে কি দিলেন বিধাতা! একটানা দুর্ভোগ বইতো নয় ? তবে আর কি প্রয়োজন ছিল তাকে এই বিশ্বে পাঠানোর ? ছাত্রাবস্থা থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত সুখ বলে কোন কিছুর মুখ দেখেননি তিনি। একমাত্র বোন, মৃত্যুকালে তার দেখাও জুটলো না তার কপালে।

নাদিরার কথা খেয়াল হতেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাসায় লোক পাঠিয়ে জানলাম, ঢাকা থেকে আসেনি কেউ এখনও। রীতিমতো সমস্যা হলো এনিয়ে। লোক পাঠিয়ে ঢাকা থেকে নাদিরাকে আনতে হলে প্রায় দু'তিন দিনের ব্যাপার। ডেডবডি এত সময় উপরে রাখা অসম্ভব। কাজেই পুনরায় 'তার' পাঠিয়ে বসে রইলাম অপেক্ষায়। পরের দিন চলে এলো ঢাকা মেল। চলে এলো ঢাকা থেকে ফেরার মুষ্টিমেয় বাস ক'টি। তবু কেউ না আসায় দাফন, কাফন সম্পন্ন করে ফিরে এলাম গৃহে। নাদিরার এই আচরণে রুষ্ট হলাম মনে মনে। জরুরী তার পাঠিয়েছি দুইজনকে। কেউ না কেউ পাওয়ার কাথা।

বইঘর.কম ও রোকন

কিন্তু 'তাঁর লীলা কে বুঝিতে পারে।' কে জানতো, ঐ একই দোষ আমার উপরও আরোপ করেছেন অন্যখানে আর একজন! কে জানতো আরো আঘাত, আরো বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে পরম আগ্রহে!

বাড়ীর বারান্দায় পা দিতেই দুই দুই খানা টেলিগ্রাম নিয়ে হাজির হলো পিয়ন। টেলিগ্রাম গ্রহণ করে ক্ষীপ্র হস্তে খুলে ফেললাম খাম। টেলিগ্রামে চোখ দিতেই ধড়াস করে আছাড় খেলো হৃদপিন্ড। ঢাকা থেকে রহমান সাহেব পাঠিয়েছেন এ টেলিগ্রাম। তিনি জানিয়েছেন, নাদিরা ইজ মার্ডার্ড! কাম শার্প উইথ আমিন সাহেব।"

সাব্বাস অদৃষ্টের পরিহাস! আমিন সাহেবকে সাথে নিয়ে আমি যাবো নাদিরার ডেডবডি দেখতে, না নাদিরাকে সাথে নিয়ে তিনি আসবেন আমিন সাহেবের ডেড বডি দেখতে।

ট্রেন-বাস আর কিছুই নেই, দেহে শক্তি নেই, চিন্তা কারার সামর্থও নেই। অবসন্ন দেহ কোন মতে টেনে এনে টান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

বাস যোগাযোগ না পেয়ে পরের দিন ট্রেন ধরে ঢাকায় গিয়ে পৌঁছালাম তার পরের দিন। খবর পেয়েই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন রহমান সাহেব। বললেন, "এই যে ফরহাদ সাহেব, আমি 'তার' পাঠিয়েই আপনার 'তার' পেলাম। উঃ! দুর্ঘটনার কি মর্ম্মান্তিক সিকোয়েন্স! কি হয়েছিল আমিন সাহেবের!"

সংক্ষেপে জবাব দিলাম, "এ্যাপেন্ডিসাইটিস" রহমান সাহেব বললেন, স্যাড! আরো অধিক স্যাড হলো, নাদিরার যে সর্বাধিক গুণগ্রাহী সেই কে. আলমই খুন করেছে নাদিরাকে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, "আলম সাহেব।" রহমান সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আলম সাহেব। সাহেবই বটেন। নাদিরাকে নিয়ে যে কি রকম মাতামতি শুরু করেছিল সে তাতো আপনিও দেখে গেছেন খানিকটা! আসুন বলছি সব!

ঘরে বসে রহমান সাহেব যা বললেন, তা হলো, নাদিরার প্রতি কে. আলমের আগ্রহ বা আকর্ষণ বাড়তে থাকে ক্রমেই। শেষের দিকে নাদিরার আপত্তি সত্ত্বেও নাদিরার জন্যে কাপড়-জামা-প্রসাধনী প্রায় প্রতিদিনই আনতে থাকে কে. আলম। সে বরাবরই একটু মেয়ে ঘেষা বলে প্রথম প্রথম কেউ গায়ে মাখেনি বড় একটা। সতর্ক হওয়ার সময় যখন এলো, ঠিক তখনই ঘটে গেল ঘটনা। সিনেমাতে সুযোগ করে দেয়ার একটা টোপ্ আগে থেকেই ফেলে রাখে কে. আলম। ঘটনার

বইঘর.কম ও রোকন

দিন শুটিং দেখানোর এবং ডাইরেকটারের সাথে পরিচয় করে দেয়ার ভাওতা দিয়ে কে. আলম নাদিরাকে নিয়ে যায় শহরের উপকণ্ঠে এক গোপন আড্ডায়। সেখানে ছিল তার এক দুষ্কর্মের দোসর। বেকায়দায় ফেলে নাদিরাকে কুকর্মে লিপ্ত হতে প্রস্তাব দেয় কে. আলম। নাদিরা তা অস্বীকার করায় হাত মুখ বেঁধে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করে দু'জন। কে. আলমের দোসরটি ছিল অপর একটি জঘন্য অপরাধের সংঘটক। তাকেই ফলো করে সেই আড্ডার দিকে ধাওয়া করে পুলিশ। সন্ধান পেয়েই পালিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে কে. আলম গুলি করে নাদিরাকে। সে মরে গেছে ভেবে নিয়েই দ্রুত পালিয়ে যায় ওরা। কিন্তু তখন প্রাণ ছিল নাদিরার। জ্ঞানও ছিল পুরোপুরি। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আনলো মৃত্যুর আগে ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়ে হাসপাতালে মারা যায় নাদিরা।

রহমান সাহেবের বর্ণনা শেষ হওয়ার পরও আমি আর কথা বলতে পারিনি কিছুক্ষণ। হিসেব করে দেখলাম, দুই ভাইবোনের মৃত্যু ঘটেছে একই দিনে। কারো জন্যে কারো হা হুতাশ কারার অপেক্ষা রাখেনি কেউ। কি ভাগ্য নিয়েই না এ ধরাধামে এসেছিল এরা। নিজের বঞ্চিত জীবনটাকে চির বঞ্চিত রেখেও বোনটাকে সুখী করতে চেয়েছিলেন আমিন সাহেব। কিন্তু পারলেন না। শিল্পী হিসাবে অনন্য প্রতিষ্ঠা লাভের বিপুল সম্ভাবনা ও অনন্ত আগ্রহ ছিল নাদিরার। কিন্তু সে সুযোগ সে পেলোনা। তার এই বঞ্চনার জন্যে কে দায়ী ? শুধুই কি বিধাতা ? সমাজের কি বিন্দুমাত্র অবদান নেই এতে ? প্রায়শই শুনা যায়, অভিনয়ের সাথে জড়িত মেয়েদের অনেকেই ভ্রষ্টা! তাই যদি বা হয়ও, কে দায়ী সে জন্যে। তাদের সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখার অন্তরায় কারা ? কে তাদের বাধ্য করে সর্বস্ব খোয়াতে ? নাদিরার মতো তো আর মরতে চায় না সবাই? বাঁচার সাধ কার না আছে জগতে ? কে না চায় ধন, মান, যশ ও প্রতিষ্ঠা ? নাদিরাও যদি দুর্বৃত্তদের প্রস্তাবে সম্মত হতো, তাকে মরতে হতোনা এভাবে। হয়তো প্রতিষ্ঠাও পেতে পারত সে।

এই সাথে মনে পড়ে আর একটি ঘটনা। অভিনয়ে পারদর্শিনী হওয়ায় দু'টি দুঃস্থ অথচ ভদ্র ঘরের মেয়ে কিছু অর্থের বিনিময়ে মাঝে মধ্যে অংশ নিতো স্থানীয় নাটকে স্থানান্তরে অন্য একটি সৌখিন দলের অভিনয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সুপারিশে রোল করতে যায় তারা। কিন্তু কি বিচিত্র আচরণ আমাদের। সেই স্থানেরই কিছু কর্মকর্তার যোগ সাজসে হাইজ্যাক হয়ে হারিয়ে যায় মেয়ে দু'টি।

বইঘর.কম ও রোকন

দুইদিন দুই রাত্রির পর তাদের অর্ধমৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এক বিলের ধারে। বহুজনের পাশবিক অত্যাচারে তাদের সর্বাঙ্গ বিক্ষত। অতঃপর সমাজে আর স্বীকৃতি পায়না তারা। প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা ঘরকন্যায়। তাই বাধ্য তারা বেছে নেয় অবাঞ্ছিত পথ। অভিনয় এখন তাদের সেকেন্ডারী জীবিকা।

হে আমার সমাজের চিরপবিত্র শ্রীকৃষ্ণগণ, তোমাদের শত কোটি নমস্কার।

# বার

নাদিরার কবরে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলে পুনরায় ফিরে এলাম স্বগৃহে। প্রায় মাস দু'য়েক কাল ধরে নিরন্তর বসে রইলাম গৃহকোণ। বেরুলাম না কোথাও। মনও বসলো না কোন কাজে। পথ চেয়ে চেয়ে পর পর দু' দুখানা চিঠি দিলো হেনা। শেষেরটিতে অভিমান ও অভিযোগের ঝাঁঝ ছিল তীক্ষ্ম। তবু উত্তরে শুধু মাত্র ক্ষমা চেয়েই নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি তাকে। নাদিরা আর আমিন সাহেবের অপমৃত্যুর আঘাতটা খুব বেশী শক্ত ভাবে লেগেছিল অন্তরে। ওটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগলো অনেক। এর পর ধীরে ধীরে সংসারের টুকিটাকি করণীয় সম্পন্ন করলাম। অবশেষে একদিন অবসন্ন মনটাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে হেনার কাছে যাবো বলে বের হলাম বাড়ী থেকে। বসন্ত বিগত প্রায়। তবু শেষ হয়নি শীতের জের। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে চেপে বসলাম ট্রেনে।

ছুটে যাচ্ছে ঢাকা মেল। এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে কেটে যাচ্ছে সময়। সিরাজগঞ্জে পৌঁছে শুনি, ফেরী বিভ্রাট। অদ্যরজনীর অবসান হবে এ পারেই বসে বসে। ট্রেনটি ঘাট পর্যন্ত পৌঁছলেও, ভবের ওপারে পৌঁছানোর হয়তো সহজ হবে অনেকখানি, কিন্তু যমুনার ওপারে পৌঁছানোর আশা নিরানব্বুই ভাগ নেই। একশোভাগ বলা যায় না এই কারণে যে, দৈবাৎ যদি অলৌকিক প্রক্রিয়ায় খন্ডন হয় বিভ্রাট, তবে কথা আলাদা। দেখলাম, এই দৈবাৎ এবং অলৌকিক কারবারগুলোর উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই বেশ কিছু যাত্রীর। তারা ট্রেনের কক্ষ ত্যাগ করে শয়ন কক্ষের সন্ধানে নেমে যাচ্ছে শহরে। আমি আবার কোন মাতব্বর ? ঘাটের মরা হওয়ার জন্যে আমি কেন মরতে যাবো ঘাটে। সারারাত পড়ে পড়ে আমি কেন লহু পিয়াবো খাটমলকে।

কম্বল সম্বল করে নেমে পড়লাম, আমিও। সারা শহর ঘুরে ঘুরে হোটেল পেলাম একপ্রান্তে। বিছানা পত্তর পেতে সুস্থির হয়ে বসতেই কানে এলো এক বিকট আওয়াজ– মাইকের দৌরাত্ম্যঃ "হৈ হৈ কান্ড রৈ রৈ ব্যাপার স্বর্ণালী অপেরার অদ্যই শেষ রজনী। নাচে গানে ভরপুর জমকালো পালা। দেখতে পাবেন মন মাতোনো অভিনয়, দম ফাটানো কৌতুক। আরো দেখবেন একঝাক ডানাকাটা পরী। আসুন-দেখুন-নয়ন মন স্বার্থক করুন!"

হাত পা গুটিয়ে ঘন্টাকয়েক বসে থাকার পর আহারান্তে ভাবলাম, এই বদ্ধঘরে সারারাত উঠ-বোস না করে যাই না হয় স্বর্ণালীর প্যান্ডেলে। অনেকদিন পর আবার বদল করি রুচি। বেশীক্ষণ টিকে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও যে নেই, তা ডানা কাটা পরীদের প্রাচুর্যেই পরিষ্কার। হোটেলের দ্বার খুলে দেয়ার মতো মোটা একটা দক্ষিণা দরাজ দিলে গুঁজে দিলাম দারোয়ানের হাতে, চলে এলাম প্যান্ডেলে। টিকেট কেটে সীটে বসতেই শুরু হলো পালা। পরীবিবিদের পীড়ন শেষ হয়েছে দেখে তৃপ্ত হলো চিত্ত, কিন্তু আত্মার তৃপ্তি ঘটলো না অভিনয় দেখে। দলটি নিতান্ত নিম্নমানের। ঝুমুর দলের অল্প একটু উপরে। উঠি উঠি করতেই শেষ হলো একদৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্যের শিল্পীরা মঞ্চে ঢুকে দু'চার কথা বলেই দাঁড়িয়ে গেল কাঠ হয়ে। এর পর যার আসার কথা, তিনি এলেন না। প্রম্পটার সাহেব ঘায়ের পর ঘা দিলেন বেলে। কিন্ত সব বৃথা তিনি এলেন না কিছুতেই। দাঁতের উপর দাঁত পিষে নেমে গেলেন মঞ্চে-আসা শিল্পীরা। দর্শকেরা জুড়ে দিলো চিৎকার।

হন্ত দন্ত হয়ে মঞ্চে এলেন দলপতি। করজোড়ে বললেন, "নায়ক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঘটেছে এই বিভ্রাট। অচিরেই আবার শুরু হবে বই। এখন নাচ দেখুন।"

রঙ্গটা জমে উঠলো ভালই। অবস্থাটা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে বসে রইলাম চুপ করে। পরীনাম্নী কতকগুলো শেওড়া গাছের 'ওরা' এসে কমবয়সী দর্শকদের কাঁচা মাথা খেতে লাগলো চিবিয়ে। সেদিকে চোখ না দিয়ে আমি কান দিলাম পাশে বসা দর্শকদের বাক্যালাপে। একজন বললেন, "অসুস্থ না ছাই! শালা আজ আবার টেনেছে বোধ হয় এক সাথে কয়েক বোতল! অপর একজন বললো, ঐটেই তো দোষ। নইলে এ্যাকটিং যা করে না, একেবারে ইউনিক। কোন বড়দলেও এমন প্লেয়ার দেখা যায় না। প্রথমজন বললেন, তা অবশ্য ঠিক। ওর জন্যেই টিকে আছে এ দল।

বইঘর.কম ও রোকন

প্রস্থান করলেন মামদোমিয়ার প্রেয়সিরা। বই শুরু হলো আবার। এবার প্রম্পটারকে বেল বাজাতে হলো না। যথা সময়ে ক্যাচিং ধরে টলতে টলতে মঞ্চে এলেন নায়ক। কিন্তু একি। এ যে আব্দুল্লাহ।

অপার বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চেহারার সেই জৌলুষ তার বিন্দুমাত্র নেই। জ্বলেপুড়ে খাক হয়েছে সর্বাঙ্গ। হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে চিবুকের। চোখ দুটো ঢুকে গেছে কোটরে। আরো লক্ষ্য করলাম, সে পার্ট টুকু আউরে যাচ্ছে কোনমতে, কিন্তু অতিরিক্ত নেশা করার কারণে টলতেই আছে অবিরাম!

চেয়ারে হেলান দিয়ে বন্ধ করলাম চোখ, এ কি করে হয়! তার ওখান থেকে আসার আমার বছরটাই পুরেনি। এরই মধ্যে এতটা কি করে সম্ভব! সালেহাকে নিয়ে সে উঠে গেছে ঐ গ্রাম থেকে—এই টুকুই জানি। এরপর এমন কি বিপর্যয় এলো তার জীবনে, যার জন্যে আবদুল্লাহর এ দশা!

ইচ্ছে হলো, এখনই ছুটে যাই গ্রীণ রুমে। তার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করি কারণ। কিন্তু ভেবে দেখলাম, তাতে হয়তো আবার বেসামাল হবে আবদুল্লাহ। মাটি হবে বই। তাই বাধ্য হয়ে শেষ অবধি বসে রইলাম প্যান্ডেলে। ব্রেণের মধ্যে ছুটতে লাগলো ঝটিকা একস্প্রেস। www.boighar.com

রাত কিছু বাঁকী থাকাতেই শেষ হলো পালা। আমি ছুটে গেলাম গ্রীণরুমে। মেকআপ তুলতে ব্যস্ত তখন আব্দুল্লাহ। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম দরজায়। কাজ শেষ হতেই তাকে ডাক দিলাম বাইরে। আমার উপর নজর পড়তেই সে স্বভাবজাত উল্লাসে "ওস্তাদ" বলে ছুটে এলো বাইরে। বললো, কি ব্যাপার ওস্তাদ। আপনি এখানে ?" বললাম, আমারও তো ঐ একই প্রশ্ন – তুমি এখানে?"

মলিন হলো, আব্দুল্লাহর মুখমন্ডল। "সে অনেক কথা ওস্তাদ। আসুন, ঐ প্যান্ডেলের চেয়ারে একটু বসি।"

প্যান্ডেল তখন ফাঁকা। দু'জন মুখোমুখি বসলাম দর্শকদের গ্যালারীতে। বললাম, "এই তো প্রায় সেদিন দেখা! কি হলো এরই মধ্যে ?

সে ভারী গলায় বললো, এরই মধ্যেই অনেক কিছু ঘটে গেছে ওস্তাদ। ম্যাচ ওয়াটার হ্যাজ ফ্লোবাই দি গ্যাঞ্জেজ।"

– কি ব্যাপার বলোতো ? সালেহা কোথায় ? সে কেমন আছে ?

– কেমন আছে তা বলতে পারিনে। তবে কোথায় আছে তা বলতে পারি।

– মানে। কোথায় ?

পরলোকে।

চীৎকার দিয়ে বললাম, "আব্দুল্লাহ।"

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে পরে ধীরে ধীরে ধরা গলায় বললাম, "ঘটনা কি বলতো ?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আব্দুল্লাহ বললো, "আপনি হয়তো জানেন না, আপনি যাবার মাস দুয়েক পরই ঐ গ্রাম থেকে উঠে যাই আমরা।"

তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "না না, ও খবর আমি পেয়েছি। তুমি সালেহাকে তার বাপের বাড়ি রেখে গেছো-এ পর্যন্ত জানি।"

সে বললো, "জানেন ? তো ভালই হলো। এরপর থেকেই বলি। নেহায়েত লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে আমার শ্বশুড় বাড়ীতেই ঠেশেগুঁজে রেখে এলাম সালেহাকে। তখন আমার দলের প্রস্তুতির কাজ জলছে পুরোদমে। দিন পনের পরেই লোক এসে খবর দিলো, সালেহা এখন পথে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তার বাপ। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম শ্বশুরের গায়ে। সালেহাকে পেলাম এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে।

একটু দম নিলো আব্দুল্লাহ! বললাম, "তাড়িয়ে দেয়ার কারণ ?"

বললো, "তা বড় করুণ। শ্বশুর আমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে ইলেকশনে নেমেছিলেন তখন। বেরিয়ে যাওয়া মেয়ে আর যাত্রা করা জামাই-এদের সংশ্রব তখন নাকি তার পক্ষে ছিল অতি মারাত্মক। ইলেকশানের পথে দুর্লংঘ বাধা। তাই, আমাকে তালাক দিয়ে একজন পরহেজগার লোককে নিকাহ করলে তবেই তিনি মেয়ে সংশ্রব রাখতে পারেন, নচেৎ নয়। আমি চলে আসার পর এ ব্যাপারে সালেহার উপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেন তিনি। সালেহা তা অস্বীকার করায় রুষ্ট হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলেন শ্বশুর সাহেব। তার কাপড়-জামা, বাক্স টাক্স নিজের হাতে ছুড়ে দিলেন পথে। শ্বাশুড়ীটা বেঁচে থাকলে হয়তো এতখানি হতোনা। উনিতো আর নেই। সালেহার তখন সৎমায়ের সংসার। আর এ কারণেই তার গহনাপত্র ও নগদ পুঁজিটাও খোয়া গেলো সেখানে।"

একটু নীরব থেকে ফের শুরু করলো আব্দুল্লাহ। বললো, "সালেহা তখন ছয় মাসের গর্ভবতী। উপায়ন্তর না দেখে সালেহাকে সাথে নিয়েই চলে এলাম পার্টিতে। মাস খানেক কোন মতে চললো। কিন্তু ভয়ানক অসুবিধা দেখা দিলো, দল যখন বায়না খাটতে বেরুলো গ্রামে গঞ্জে-বন্দরে। তখন কোন দিন রাত কাটে প্ল্যাটফরমে, কোনদিন প্যান্ডেলে, কোন দিন স্কুলে, ক্লাবে বা সদ্য তোলা টিনের

বইঘর.কম ও রোকন

ছাপড়ায়। এতে সালেহার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সম্ভ্রম– সব কিছুই রক্ষে করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। অতিরিক্ত অনিয়মে শেষ অবধি শয্যা নিলো সালেহা। তাকে বাঁচাবার প্রয়াসে সিজনের মাঝখানে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করলাম দল। নিকটবর্তী এক শহরে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া করে থাকতে লাগলাম সেখানে। সিজনের মাঝখানে দল ছেড়ে দেওয়াতে দল থেকে আসতে হলো একেবারেই রিক্ত হস্তে। ক্ষতিপূরণটাই যে দিতে হয়নি। চুক্তি ভঙ্গ করার দরুণ, সেইটেই রক্ষে। বাড়ীঘর বিক্রি করার অবশিষ্ট সামান্য পূঁজিটাও ফুরিয়ে গেল একমাসেই। সালেহার তখন একেবারে এ্যাডভান্স স্টেজ। এখন তখন অবস্থা। শরীরটাও তার খারাপই চলতে লাগলে বরাবর । নিরুপায় হয়ে শুরু করলাম ছাত্র পড়ানো। ঘুরে ঘুরে টিউশানী করে যে সামান্য এবং অনিশ্চিত পয়সাটাও আসতে লাগলো হাতে, তা দিয়ে বাড়ীভাড়া দিলে দুই বেলা খাওয়ার সংস্থান থাকে না, দুইবেলা খেতে গেলে বাকী পড়ে বাড়ীভাড়া। এমনই টানা পোড়েনের মাঝে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে পুনরায় শয্যা নিলো সালেহা। এখন আবার দেখা দিলো আর এক বিপদ। আত্মীয়-স্বজন বিবর্জিত একেবারেই বিভূঁইয়ে টিউশানী করতে গেলে সালেহাকে দেখার কেউ থাকেনা, সালেহাকে দেখতে গেলে এক বেলার একমুঠো মোটা অন্নও জোটে না। হয়তো নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছেন, দুইবেলা দু'টো মুখে দেয়ারই সংস্থান নেই যার, তার কাছে রুগীর চিকিৎসা ও পথ্যের প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। শেষের দিকে ওষুধপথ্য দূরের কথা, তাকে দুই বেলা পেটভরে বার্লিটাও খাওয়াতে পারিনি আমি। একেবারেই অচিকিৎসা আর অনাহারে চোখের সামনে ধুকে ধুকে সালেহা মারা গেলো ওস্তাদ। হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললো আব্দুল্লাহ। কাঁদতে কাঁদতে বললো, ছেলেটাও চলে গেল দিন দু'য়েকের মধ্যেই।

কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো আব্দুল্লাহ। তাকে সান্তনা দেয়ার ভাষা খুঁজে না পেয়ে নীরবে বসে রইলাম বজ্রাহতের মতো। সে খানিকটা আশ্বস্ত হলে বললাম, তোমার এমন দুর্দিন গেলো, তবু আমাকে একটু স্মরণ করতে পারলেনা ?"

উত্তরে সে বললো, "কি করে করি ওস্তাদ! কোথায় আছেন আপনি আর আপনারই বা কেমন চলছে তা সন্ধান করি কি করে, আর করিই বা কখন ?"

কথা ঠিক। এর জবাব খুঁজে পেলাম না। আমি ও যে একজন নিঃস্ব লোক, এইটুকুই তো জানে তারা। তাছাড়াও, আমার আবার যেখানে রাত, সেখানে কাত।

আমাকে নীরব দেখে আব্দুল্লাহ্ ফের বললো, এরপর আর কি করি। কিছুদিন পাগলের মতো ঘুরে বেড়ালাম মাঠে-ঘাটে, এখানে সেখানে। কিন্তু পেটটাতো রয়ে গেলো সাথেই। তাই অবশেষে ঢুকলাম এই দলে।"

বললাম, "তা দলেই যদি ঢুকলে, এ দলে কেন? কোন ভাল দলে গেলে পারতে?"

বললো, "না ওস্তাদ। সে সাধ্য আর নেই। এখন ঠিক থাকে না তাল, মনে থাকে না রোল, দুর্বল শরীরে বড় ভূমিকা টানতেও পারিনে তেমন। বড় দল নেবে কেন আমাকে? এই ভাল আছি।

এরপর আব্দুল্লাহকে নিজের কাছে রাখার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। সে রাজী হলো না। অতীত মুছে ফেলে আবার বিয়ে থা করে নতুন ভাবে জীবন শুরু করার উপদেশ দিতেই সে প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে বললো, "দোহাই ওস্তাদ, ও কথা বলবেন না। আমার জন্যেই সালেহার এই পরিণতি। আমার জন্যে সে প্রাণ দিলো, তবু আমাকে ত্যাগ করে গেলো না। তার আসন অন্যজনকে দেই আমি কি করে? সে অধিকার আমার নেই ওস্তাদ! ওটি আর সম্ভব নয়।"

আব্দুল্লাহকে আমার হোটেলে আনার চেষ্টা করলাম। সেটাও সে পারলোনা। বললো, "আজকেই আমাদের যেতে হবে অন্য জায়গায়। আজ রাতেই সেখানে দিতে হবে বই। সকাল দশটায় ট্রেন। দু'টো খাবোদাবো, একটু বিশ্রাম নেবো। এখন আপনার সাথে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে ওস্তাদ। বরং যদি পারেন, দশটার সময় আসবেন একবার ইস্টিশানে। বলা যায়না, হয়তো এইটেই হবে শেষ দেখা।"

–আব্দুল্লাহর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো পানি। আমি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে রোধ করলাম উদগত কান্নার বেগ!

বহু সাধা সাধি করেও আবদুল্লাহর মনোভাব পরিবর্তন করতে না পেরে, দশটার সময় দেখা করার ওয়াদা করে, চলে এলাম হোটেলে।

দশটার সময় ইষ্টিশানে গিয়ে আব্দুলাহকে তুলে দিলাম ট্রেনে। আমার নিজ গৃহের ঠিকানাটা লিখে দিলাম কাগজে। ছেড়ে দিলো ট্রেন। যদিও আর নেশাটেশা করবে না বলে আমকে কথা দিলো আব্দুল্লাহ, তবু আমি বুঝি, এ ওয়াদা রক্ষে করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। যে কয়দিন বাঁচে, এমনি ভাবেই পথে প্রান্তে তাড়ি মদ খেয়েই অনিয়মে অযত্নে সে টেনে বেড়াবে তার এই দুর্বিসহ জীবন। আমার

বইঘর.কম ও রোকন

ঠিকানাটাও হারিয়ে ফেলবে বেখেয়ালে। অবশেষে একদিন পথে প্রান্তেই মুখ থুবড়ে পড়ে অতদ্বির ও অচিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ হবে তার আয়ু। তার সামনে নিভে যাবে এ দুনিয়ার আলো। দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলারও পাশে রইবে না কেউ।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ট্রেন। আমি একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই দিকে আব্দুল্লাহকে নিয়ে ট্রেনটি চোখের আড়ালে হতেই, বুক ফেটে কান্না এলো আমার। মনে হলো, একবার উচ্চ স্বরে চীৎকার করে বলিঃ হে সর্বনেশে সংস্কৃতি। হে অলুক্ষণে আর্ট অব ড্রামা! বজ্রপাত হোক তোমার মাথায়– উচ্ছন্নে যাও তুমি– নিশ্চিহ্ন হও নিঃশেষে! এই দুর্ভাগা দেশ থেকে তুমি সমূলে ধ্বংস হয়ে তোমার ছোবলের নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষে করো এ দেশের সুকুমার মনোবৃত্তির কিছু হৃদয়বান মানুষকে!

# তের

আব্দুল্লাহকে বিদায় দিয়ে হোটেলে ফিরে এসে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম ঘুমানোর। পারলাম না। সন্ধ্যায় ঢাকামেল ধরে হেনার কাছে যাওয়ার কালে সারারাত কাটালাম ট্রেনে ও ফেরিতে। তবু তিল পরিমান ঘুমের উদ্রেক হলো না। চোখ দু'টো জ্বলতে লাগলো অসম্ভব। মাথার মধ্যে ছুটতে লাগলো অনল প্রবাহ। আব্দুল্লাহর সাথে কথা বলার কালে শেষ রাতের শীত লাগে বুকে। মানসিক চাঞ্চল্যের দরুণ ওটা গায়ে মাখিনি তখন। আজ আবার ভোরের দিকে ঠান্ডা লাগলো খুব। কম্বলাদি গায়ে এঁটে বসে রইলাম গাড়ীতে। গাড়ী থেকে নামতে গিয়েই বুঝতে পারলাম আলামত। থর থর করে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ। কম্বলটি গায়ে দিয়েই কোনমতে রিক্সায় এসে উঠলাম হাত দিয়ে বুঝলাম, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে কপালে। ভয়ানক বিব্রত বোধ কারলাম। এ অবস্থায় হেনার কাছে যাওয়া আমার ঠিক কিনা আদৌ, এ কথা ভাবতে গিয়েও ভাবার সুযোগ পেলাম না। ক্রমেই চোখের সামনে আধার হয়ে আসতে লাগলো দশ দিক। বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো মাথা। বিপুল বেগে কাঁপতে লাগলো সর্বাঙ্গ। মনে হলো, কে যেন দুইহাতে তুলে আমাকে অবিরাম আছড়াচ্ছে সবলে। শেষ পর্য্যন্ত রিক্সার উপর বসে থাকা একেবারেই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। নিরুপায় হয়ে রিক্সাওয়ালাকে তাকিদ দিলাম, যত দ্রুত সম্ভব আমাকে হেনার হোস্টেলে পৌঁছে দিতে। তখন বেলা বোধকরি দশটা। গেটে গিয়ে রিক্সাওয়ালা দারোয়ান মারফত

খবর পাঠালো হেনাকে। খবর পেয়েই ছুটে এলো হেনা। দারোয়ান ও রিক্সাওয়ালার সাহায্যে ধরাধরি করে আমায় নিয়ে এলো হাসপাতালে। এর পর আর খেয়াল নেই। সংজ্ঞালুপ্তি ঘটলো আমার হাসপাতালে পৌঁছেই।

একটানা কেটে গেলো সেদিন এবং রাত। জ্ঞান ফিরলো পরের দিন দশটায়। চোখ মেলে দেখি, আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের কেবিনে। ঘরে অনেক লোক। আমার এক পাশে হেনা, অন্যপাশে ডাক্তার। আমাকে চোখ মেলতে দেখেই ডাক্তার সাহেব বললেন, "আর কোন ভয় নেই। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন উনি। অতপরঃ আমাকে প্রশ্ন করলেন, কেমন বোধ করছেন এখন ?"

বললাম, "একটু ভাল। তবে মাথার মধ্যে খুব যন্ত্রণা।"

www.boighar.com

ডাক্তার বললেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার একটু ঘুমোন।"

তখনই একটা ওষুধ খাইয়ে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। আমি একটু এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ালাম পুনরায়।

দুপুরের দিকে ঘুম ভাঙ্গলো যখন, তখন দেখি হেনা আমার কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছে জ্বর। আমার মাথা তখন পাতলা, তাপটাও স্বাভাবিক। আমি উঠে বসার চেষ্টা করতেই হেনা আবার জোর করে শুয়ে দিলো আমাকে। বললো, "আরে" করেন কি ? শুয়ে থাকুন এত তাড়াতাড়ি উঠার চেষ্টা করবেন না।

বললাম, "কতক্ষণ শুয়ে আছি ?"

বললো, "অনেকক্ষণ। একরাত একদিনেরও উপরে। মাথার যন্ত্রণাটা কমেছে?

– কমেছে।

বেশ। এবার চুপ করে শুয়ে থাকুন।

একটু পরে আমাকে দুধ বার্লি খাইয়ে দিয়ে চলে গেল নার্স। হেনাও বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে বললো, "চুপ করে ঘুমানোর চেষ্টা করুন আবার। আমি খানিক পরেই আসছি।"

বললাম, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

– কোথায় মানে! হোস্টেলে।

– হোস্টেলে ?

–হ্যাঁ, নাওয়া খাওয়া নেই আমার ?

বইঘর.কম ও রোকন

–ও!

– আপনি চুপ করে শুয়ে থাকবেন। উঠার চেষ্টা করবেন না যেন।

বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করেই হেনা আবার ফিরে এসে বললো, ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে আপনাকে ভুলেই গেছি।

বললাম, "কি কথা ?"

বললো, "আপনি আমার কে হন, একথা যদি জিজ্ঞেস করে কেউ, বলবেন আপনি আমার স্বামী।

চমকে উঠলাম হেনার কথায়। বললাম, স্বামী ? কার ? আপনার ?

হ্যাঁ, তাই বলবেন। আর আমার আয়ার বা অন্য লোকের সামনে বেশী 'আপনি আপনি' করবেন না।

– মানে। আমি তা বলতে যাবো কেন ?

– কেন সেটা পরে। যা বললাম, দয়া করে তাই করবেন। নইলে বিপদ হবে।

বেরিয়ে গেল হেনা। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এমন কথা বললো কেন সে। কিছুক্ষণ এলো মেলো ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম আবার। কয়রাত্রি ঘুম না হওয়ায় এটা বোধ হয় খেশারত। ঘুম ভাঙ্গলো একেবারে শেষ বেলায়। দেখি ঘরের দরজা মেলানো, কিন্তু ঘরে নেই কেউ। ঘুম ভাঙ্গার পর একেবারেই সুস্থ বোধ করায় উঠে বসলাম বিছানায়। তারপর ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামলাম। দাঁড়াতে কোন অসুবিধে না হওয়ায় আস্তে আস্তে বাথরুমে গেলাম। বাথরুম থেকে এসে হাত মুখ মুছে বিছানায় পাশে এসে দাঁড়াতেই 'রে-রে' করে ঘরে ঢুকলো হেনা। বললো, সর্বনাশ! এতো একবারেই অপঘাতে মরবে দেখছি। একটু আগে দেখে গেলাম একেবারেই অচেতন, আর এরই মধ্যেই শুরু হয়েছে উঠে বেড়ানো ? বসুন, চুপ করে বসুন দেখি বিছানায়।

আমাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে, হেনা আমার পাশে বসে বেদানার দানা ছড়াতে লাগলো। আমি অপলক নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। পরে ধীরে ধীরে বললাম, "আপনি আমাকে ও কথা বলতে বললেন কেন ?"

সে বললো, "কোন কথা ?"

– ঐ যে, আমি আপনার কে হই, একথা কেউ জিজ্ঞেস করলে যে কথা বলতে হবে ?

বইঘর.কম ও রোকন

– ওটা বলতে হবে তাই।

– কেন বলতে হবে ?

– শুধু আজ নয়, যে কয়দিন এখানে আছেন এবং আবার যখন আসবেন- সব সময় কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আপনি আমার স্বামী – ব্যাস।

– কিন্তু তা কেন বলতে যাবো আমি ? আমি তো আর সত্যি সত্যিই স্বামী নই আপনার ?

– কে আপনাকে সত্যি সত্যিই স্বামী হতে বলছে ? আমার দায় পড়েছে বলতে তা!

–তবে ?

– তবে দায়ে ঠেকে বলতে হবে, তাই।

– দায়। কি সে দায় ?

– আমি সবাইকে ঐ কথা বলেছি যে।

– আপনি। আপনি বলেছেন, আমি আপনার স্বামী।

– হ্যাঁ, আমিই বলেছি।

– কিন্তু আপনি তা বলতে গেলেন কেন ?

– ইশরে! একে নিয়ে তো আর পারিনে!

–মানে ?

ওটা না বললে, চাকরী বাকরী বাদ দিয়ে হোস্টেলে মেস ছেড়ে এই হাসাপাতালের ক্যাবিনে দিনরাত আপনার কাছে থাকতে পারতাম আমি ? একজন পর পুরুষের সাথে রাত্রিযাপন করছি, এটা লোকে জানলে, চাকরী থাকবে আমার না এই এলাকায় থাকতে আমাদের দেবে কেউ ? পাবলিক নুইসেন্সের দায়ে সবাই আমাদের ধরে পুলিশের হাতে দেবে না ?

নিতান্তই সত্য কথা। ঘটনার গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম এতক্ষণে। কিন্তু তাই বলে এতবড় ঝুঁকি নিলো হেনা। আমার জন্যে এতখানি করতে পারলো সে! বিস্ময়ের ঘোরেই প্রশ্ন করলাম আবার,- "আপনি রাত্রিকালেও ছিলেন এখানে আমার ঘরে ?"

বইঘর.কম ও রোকন

হেনা স্মিতহাস্যে বললো, কেন, বিশ্বাস হয় না বুঝি ? শুধু আমিই নই, আমার আয়াটাও একসাথে ছিল।

হেনা চকিতে নজর দিলো পাশের একটা খাটের দিকে। দেখলাম, সে খাটেও বিছানাপত্তর বিছানো এবং সে বিছানাপত্তর হাসপাতালের নয়, হেনার নিজের। বললাম, আপনি এতটা করতে গেলেন কেন ?

বটে।

– এটা ঠিক হয়নি আপনার।

– তা বলতে পারেন। কারণ, নেমকহারামদের এমন বলতে আটকায় না।

– মানে ?

– মানে আবার কি ? আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ফেলে রেখে আমি হোস্টেলে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুবো- এটা আপনি হয়তো কল্পনা করতে পারেন-কিন্তু আমি তা পারি ?

– তা হয়তো–

এবার ধমক দিলো হেনা। বললো, বলুন, "বলুন,পারি আমি ?"

থতমত খেয়ে বললাম, না, তা বোধ হয় পারেন না।

–তবে ?

www.boighar.com

এর পর আর জবাব দিতে পারলাম না। হেনা বেদানার দানাগুলো এগিয়ে দিয়ে বললো, "নিন, মুখে দিন এগুলো। বীচি যেন পেটে না যায়। শুধু রস চুষেই ফেলে দেবেন।"

হেনা প্রবেশ করলো বাথরুমে। আমি বেদানার গোটা কয়েক দানা চুষেই ঠেলে দিলাম এক পাশে। একবিন্দু স্বাদ নেই মুখে। টান হয়ে শুয়ে পড়ে ভাবলাম, মস্তবড় ফাঁড়া একটা কেটে গেল ভাগ্যের জোরে। হেনার কাছে পৌঁছতে আর ঘন্টা খানেক দেরী হলে পথে পড়েই মরে থাকতাম দেবদাসের মতো। পার্বতীর পাত্তাও পেতাম না।

বাথরুম থেকে ফিরেই হেনা আমাকে প্রশ্ন করলো, "কোথা থেকে টহল দিয়ে মরতে এসেছেন আমার কাছে ? কোন যাত্রানাটকের আসর থেকে বুঝি ?"

বইঘর.কম ও রোকন

– তা মানে–

– আব্দুল্লাহ্ সাহেবেরা যাত্রা করেন, তার একটা অর্থ আছে। কারণ, উনি একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী আর ওটা তার প্রফেশান। কিন্তু আপনি ? আপনি কি ? আপনার চেহারা দেখেতো মনে হলো, আহার নিদ্রার বালাই নেই কয়দিন থেকে। কি, ঠিক কি না ?

–অনুমান আপনার সত্য। এ ছাড়া, যাত্রার আসর থেকেও যে এসেছি– এটা মিথ্যে নয়।

এর পর ধীরে ধীরে বর্ণনা করলাম, আব্দুল্লাহ্দের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। এর মধ্যে অবশ্য নাদিরাদের প্রসঙ্গটা টানলাম না – যদিও এই দুই দিকের আঘাতেই আমি কাবু হয়েছি এতখানি। কোন নারীর কাছে অন্য নারীর প্রসঙ্গ না টানাই শাস্ত্রীয় বিধান।

শুনে মর্মাহত হলো হেনা। অনেকক্ষণ সে কথা বলতে পারলো না।

রাত আটটার দিকে পথ্য এলো আমার। আমার খাওয়া শেষ হতেই হোস্টেল থেকে আয়া এলো হেনার খাবার নিয়ে। হেনা যখন খেয়ে উঠলো তখন রাত প্রায় দশটা। থালা বাটি গুছিয়ে নিয়ে বললো, "আমি এখন যাই আপা ?"

হেনা বললো, "যাও। তবে একটু সকাল সকাল এসো।"

আয়া বেরিয়ে যেতেই আমি অবাক হয়ে বললাম, "সে কি! আপনি গেলেন না?"

হেনা বললো, "কোথায় ?"

বললাম, "কেন হোস্টেলে ?"

একটু মুচকি হাসলো হেনা। বললো, "কি আমার বুদ্ধির ঢেকিরে! অসুস্থ স্বামীকে একঘরে ফেলে রেখে কেউ বুঝি রাত কাটায় হোস্টেলে গিয়ে ? আমি যদি তাই করি, তাহলে ধরা পড়তে হবে না ? ফাস হবেনা এ চালাকী ? হোস্টেলে ফিরে যাবার উপায় আছে আর ?"

বললাম, "ততো ঠিকই।

– কাজেই, যে কদিন আছেন, এ দুর্ভোগ পোহাতেই হবে আমাকে।

– আচ্ছা, আগের বার তো পরিচয় দেননি স্বামী বলে। এখন তা বলায় সন্দেহ করলো না ?

বইঘর.কম ও রোকন

একটু আধটু করে না আবার ? বললাম, আমরা নিজেরাই সেরে নিয়েছি অনুষ্ঠান। গার্জ্জেনদের জানানো হয়নি বলেই বলতে চাইনি কাউনি।

–আপনিতো বেজায় চালাক মেয়ে দেখছি।

– হয়েছে। নিন, আর বক বক না করে এবার চোখ মুজুন দেখি।

– আপনি! আপনি এ ঘরেই শোবেন ?

– নইলে আর যাবো কোন চুলায় ? নিজের আক্কেল দোষেই তো পড়েছি বিপদে। আয়াটা সাথে থাকলেও একজন অনাত্মীয়ের সাথে এক ঘরেই রাত কাটাতে হবে, এটাকি ভাবতে পেরেছি আগে।

অনুশোচনার গন্ধ পেলাম হেনার এই বক্তব্যে। তাই পাশ ফিরে শুতে শুতে হেনার কর্ণগোচর করে স্বগোক্তি করলাম– "আক্কেল যার যেরকমই হোক, কারো ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ, এসব অনাত্মীয়েরা একে বারেই ভিন্ন ধরণের অনাত্মীয়। আর পাঁচজন অনাত্মীয়র মতো এরা অকৃতজ্ঞ নয়।"

আমার সুস্থ হতে গেল আরও চার পাঁচদিন। বিদায়কালে হেনা বললো, এরপর আর আপনার এখানে আসা চলবে না বেশী। এই লুকোচুরি বেশিদিন খেলতে গেলে ধরা পড়তে হবেই।

বললাম, "সে তো ঠিকই।"

হেনা বললো, "সামনে গ্রীষ্মের ছুটি। আমি বাঘাবনে থাকবো। আপনি অবশ্য যাবেন এবার সেখানে। নইলে কিন্তু আমাকেই বেরুতে হবে আপনার খোঁজে। এ নাটককে আর বেশিদিন চলতে দেয়া ঠিক নয়। হয় এস্পার, নয় ওস্পার, একটা ইতি হতেই হবে এর।

মনে মনে বললাম, তবে তাই হোক।

## চৌদ্দ

সকাল হয়,–রাত আসে-সন্ধ্যাল হয় আবার। এসব দেখলে মনে হয় মানুষ আছে বলেই সংঘটিত হয় এসব। মানুষের প্রয়োজনেই এই সকাল সন্ধ্যার খেলা। তাদের কাজ করার কোলাহল মুখর আলো আর বিশ্রাম নেবার নিঃঝুম আঁধার

বইঘর.কম ও রোকন

চাই বলেই এই উদয় অস্তের প্রক্রিয়া। মন এটা বুঝতে চায় না যে, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, ঘর বাড়ী যেমন আছে তেমন যদি থাকেও এবং একটা মানুষও যদি এই পৃথিবীতে না থাকে, তবু দিনের পর রাত আসবে আবার– রাতের পর সকাল হবে পুনরায়। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দরে লয় হয়ে গেলেও অব্যাহত থাকবে এই গতি। সকাল বেলার বঞ্চিত রবিরশ্মি তেমনি ভাবে গড়বে এসে ধরিত্রীর শ্যামাঞ্চলে-চাই কারো বাঞ্ছিত তা হোক আর না হোক। কারো রাস্তার কাঁদা শুকিয়ে দেয়ার প্রয়োজনেও নয়, কারো ঠান্ডা লেপ উষ্ণ করা তাকিদেও নয়, রোদ যেমন আসার-আসবে তেমনি বরাবর। কারো মাঠের ফসল পুড়ুক আর না পুড়ুক বৃষ্টি যেমন নামার নামবে তেমনি চিরকাল। কালক্রমে সৃষ্টির হয়তো কোন আইটেম বৃদ্ধি পাবে প্রচুর। হয়তো বা কোন আইটেম বিরল হবে, ফুরিয়ে যাবে নিঃশেষে। উলট পালট হয়তো হবে গ্রীষ্ম-বর্ষা শীত-বসন্ত কিন্তু সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্তের কার্যক্রম অব্যাহত রয়ে যাবে, যতদিন অব্যাহত থাকবে এই দুনিয়ার অস্তিত্ব। কিছুর জন্যে আটকে যাবে না কিছুই, কারো জন্যে ঠেকে যাবে না কোন কাজ।

www.boighar.com

হেনার কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফেরার কয়দিন পরই রহমান সাহেব জানালেন, "নাদিরার মৃত্যু হেতু অপূর্ব অপেরার স্থগিত কার্যক্রম চালু হয়েছে আবার। নেতিয়ে পড়া শিল্পীরা কোমর বেঁধে খাড়া হয়েছে পুনরায়। জরা, পুত্র নাকটটি মঞ্চস্থ করবোই আমি এবার। আপনি জলদি আসুন।"

কিছু গড়ি মসি করেও হাজির হলোম শেষ পর্যন্ত। গিয়ে দেখি, মঞ্চায়নের সব কিছুই প্রস্তুত। টিকেট ছেড়েছে, কার্ড ছেড়েছে, শ্রেষ্ঠাংশে নাম ছেপেছে আমার। দেখে বিগড়ে গেল মেজাজ। রহমান সাহেবকে চার্জ করে বললাম, এতো বড় অন্যায় ভাই। নাম ছাপাবার আগে আমার মতামতটাও নেবেন না আপনারা ?"

রহমান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "বিধানতো সেটাই। কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, সবারই একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, আমি একটা কথা দিলে আপনি তা ফেলবেন না কোন দিন। তাই ওদের প্রচন্ড চাপের মুখে দিয়ে ফেলেছি মতামত। দোষ ভাই আমারই। এখন আপনি মাথায় আমার বাড়ি দিলেও কিছু বলার নেই।"

বললাম, "কিন্তু একেবারেই আমার ইচ্ছা-বিরোধী হয়ে গেল কাজটা যাত্রা-নাটক করবো না আর-এমনি একটা সিদ্ধান্তে বসে আছি আমি অথচ-"

–বলেন কি! হঠাৎ এত বৈরাগ্য ?

বইঘর.কম ও রোকন

-ঠিক হঠাৎ নয়। এ মনোভাব দানা বাধছে বেশ কিছু দিন থেকেই। দেখছেন না, এখন নাটক আমি লিখিই না বড় একটা। পারলে দু' একখান গল্প উপন্যাস লিখি না পারলে নয়।

-হ্যাঁ, আপনার উপন্যাস 'মেঘ শুধু মেঘ' পড়লাম। ওটা পড়ে মনে হলো, আমাদের নাট্যমোদী ফরহাদ আহমেদের নয়, কোন এক বিশ্ব বিরূপ বৈরাগ্যের অভিব্যক্তি ওটা।

-সে যা-ই বলেন, কিন্তু -

-নো-নো, ওসব কিন্তু ফিন্তু নট্ এ্যলাউড। সবারই বক্তব্যঃ নাদিরা নেই- নায়িকা নতুন। একমাত্র আপনি যদি নায়কের রোলে নামেন, তবেই নাকি রক্ষে পাবে সবদিক। তাই সব দিক চিন্তা করে দিয়ে দিয়েছি মতামত। আর না হলেও প্রথম রজনীর অভিনয়ে নামতেই হবে আপনাকে। এমনিতেই বইটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে শিল্পীরা, তার উপর যদি পয়লা রাতেই মার খায় এই বই ,তাহলে আর শিল্পীদের মনোবল ধরে রাখা যাবে না।

কথা অবশ্য ঠিক। বইটি একবারেই নায়ক ভিত্তিক। শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলায় সিরাজের রোল ফেল মারলে যে অবস্থা হয়, এটারও ঠিক তেমনি অবস্থা। নায়কের উপরই নির্ভর করছে সব কিছু। নায়িকার রোলটি মোটামুটি ষ্ট্যাটিক্। চরিত্রের তেমন কোন বিবর্ত্তন নেই। চাঁদ সুলতানা বা সুলতানা রাজিয়ার মতো এক ভূখন্ডের সুলতানা রূপে যেমন আছে তেমনি থাকার পূর্ব্বাপর। এতে শুধু প্রয়োজন কণ্ঠ আর ইমোশান। কিন্ত নায়কের চরিত্র একরারেই ডাইন্যামিক। নায়ক বহুরূপী। সে প্রথম অবস্থায় পথচারী, দ্বিতীয় অবস্থায় ঐ সু তানার প্রহরী, তৃতীয়তে বৈতালিক, চতুর্থতে দস্যু, তার পর সে রাজপুত্র বা শা জাদা এবং সবশেষে দেখা যাবে সে ঐ সুলতানারই স্বামী। প্রত্যেকটি অবস্থার বাস্তব পরিস্ফুটন না ঘটলে নিছকই একটা প্রহসনে পরিণত হয়ে দূর্দ্দান্ত ভাবে মার খাবে বই।

কাজেই শেষ পর্য্যন্ত সেই কথাই হলো। প্রথম রজনীর পর দলের নায়কই নামবে ঐ রোলে। ডাইরেকটারের দায়িত্ব পালনকরা পর্য্যন্তই কাজ আমার।

হাজি হলাম রিহেয়ারসেলে। যথা সম্ভব সবাইকে শক্ত করে তালিম দিলাম পুনরায়। নির্দ্ধারিত তারিখে পণ প্রতিজ্ঞা মাটি দিয়ে অনেকদিন পর মওলা বলে মঞ্চে উঠলাম আবার। শুরু হলো এ্যাকশান। সকলের সমবেত তৎপরতায় প্রথম রজনীর মঞ্চায়ণ আশাতীত সফলতা অর্জ্জন করে শেষ হলো সগৌরবে। দলের সদস্যেরা মহাখুশী। মহানন্দে রহমান সাহেব বেহুশ! ধন্য ধন্য দশদিক !

বইঘর.কম ও রোকন

পরের দিন দেখা গেল পাল্টে গেছে পরিস্থিতি। সকলের এই রকম মনোভাবের সামনে দলের নায়ক ভড়কে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। সবারই একই কথা- আমাকেই নামতে হবে পুনরায়। প্রথম রজনীর ইমেজ একবিন্দু ক্ষুন্ন করা যাবে না। কারণ, অনেক উজির নাজির ও কেউকেটে দর্শককূল ভীড় করে আসছেন আজ। দশেচক্রে ভগবান ভূত। নামতে হলো সে রাতেও। দর্শকদের অনুরোধে বই হলো পর পর আরো দু'রাত। আমিই নামলাম প্রতিরাতে। অতঃপর দর্শকদের সমপরিমাণ ভীড় থাকা সত্বেও বন্ধ হলো বই। কারণ শিল্পীদের অধিকাংশেরাই সদস্য শিল্পী-এ্যামেচার আর্টিষ্ট। প্রফেশন্যাল নন। অভিনয় তাঁদের জীবিকাও নয়। সকলেরই ব্যবসা-বাণিজ্য, কোর্ট-কাচারী, অফিস-আদালত আছে। রাতের পর রাত অভিনয় করে দৈনন্দিন ডিউটি করা সম্ভব নয় অনেকের পক্ষে। অতএব আপাততঃ ইতি।

অবসন্ন শরীরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিশ্রামের প্রয়োজনে আরো কয়দিন রয়ে গেলাম ঢাকাতে। বিদায় নেবার একদিন আগে রহমান সাহেব এসে একটু আমতা আমতা করে বললেন, "ফরহাদ সাহের, আপনাদের মতামত না নিয়েই আমি আর একটা অপকর্ম্ম করে ফেলেছি ভাই। এটুকুও সামলাতে হবে আপনাকে।"

বললাম, "কি ব্যাপার?"

বললেন, "রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টের এক পদস্ত কর্ম্মকর্ত্তা আমার ঘনিষ্ট লোক। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও বটে। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির মুরুব্বী মানুষ। অথচ খুবই কালচার‍্যাল মাইন্ডেড। তার কথা ফেলতে না পেরে আমি তাকে কথা দিয়ে এসেছি। উনি 'রাজপুত্র' নাটকটি পর পর দুইরাত দেখেছেন। এর পর জিদ ধরেছেন এই পালা উনি উনার ওখানে নেবেন। আমার এ ওয়াদা রক্ষে করতে হবে ভাই।

– উনার ওখানে মানে?

– মানে উনাদের নিজ গ্রামে। তাদের কথা দশ বিশ হাজার যা-ই লাগুক, শিল্পীদের আরাম আয়েশের কোন ক্রুটি তারা করবেন না। সিকিউরিটি স্বরূপ হাজার দশেক টাকার একটা চেক উনি দিতে গেলেন আমাকে।

– আচ্ছা।

– বললাম, টাকা উপায়ের জন্যে তো আর নাটক করি না আমরা। টিকিট যা বেচি তা শুধু সংগঠনের খরচ চালানোর জন্যে। কিছু মাইনে করা লোকও আছে তো, তাই। কাজেই কোন টাকা পয়সা লাগবে না, পারলে আমরা এমনি যাবো।

বইঘর.কম ও রোকন

–হুঁ!

– কি করি বলুন ? আত্মীয় মানুষ, নাছোড়বান্দা।

– কিন্তু সেই গ্রামটি কোন ভাগাড়ে ?

রহমান সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনাদের ঐদিকেই একেবারেই অজপাড়াগা নয়। অনেকটা উন্নত। নাম বললে হয়তো চিনতে পারেন। গ্রামটার নাম বাঘাবন।

চমকে উঠলাম। বললাম, "কি বললেন?"

রহমান সাহেব বললেন, "বাঘা বন। চেনেন নাকি ?"

তার প্রশ্নটুকু আর কানে গেল না আমার । মাথার মধ্যে তখন ঐ এক কথা "বাঘাবন!" এমনতর যোগাযোগও সম্ভব। রহমান সাহেব রাস্তা ঘাট, দিন তারিখ, সব কিছুরই বর্ণনা দিলেন। সময় মিলিয়ে দেখলাম, হেনার তখন বাঘাবনেই থাকার কথা নিজের মনোভাব গোপন করে বললাম "ঐ গ্রাম এলাকায় যেতে আপনার অন্যান্য শিল্পীরা রাজী হবেন তো ?"

রহমান সাহেব বললেন, "হবেন মানে! তারা তো এক পায়ে খাড়া। ঢাকা ছেড়ে মাঝে মধ্যে এই রকম দূর এলাকায় আউটিংস এ যাওয়ার আশা নিয়েই তো এই অপেরার উৎপত্তি। ভাবনা শুধু আপনাকে নিয়ে। যে খেয়ালী মানুষ আপনি।

স্মীত হাস্যে বললাম, ঠিক আছে, সবার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে আমি আর না করি কেন। আমিও রাজী।

কথা হলো, ম্যানেজার সাহেব ব্যবস্থাদি তদারক করতে কয়েকদিন আগেই যাবেন বাঘাবনে। মঞ্চাদি সুপারভিশনে আমি যাবো দু একদিন আগে।

বাড়ি ফিরে ব্যাপারটা হেনাকে লিখবো লিখবো বলেই কেটে গেল কয়েক দিন। একদিন চিঠি পেলাম হেনারই। সে লিখলোঃ

"আপনার জন্যে সুখবরই বলা যায়। আগামী ১৬ তারিখে সুবিখ্যাত অপূর্ব অপেরার বাঘাবনে বই। আশা করি এ কারণেও আসবেন একবার বাঘাবনে।"

চৌদ্দ তারিখেই বেরিয়ে পড়লাম বাঘাবনের উদ্দেশ্যে। খোদাবক্স জানতে চাওয়ায় তাকে দিয়ে এলাম ঠিকানা। সারাপথ আসা গেল অনায়াসে। ঠেকে

বইঘর.কম ও রোকন

গেলাম দুয়ারের কাছে এসে। আর মাত্র মাইল সাতেক পথ। এখন একমাত্র অবলম্বন শ্রীচরণ, অন্যথ্যায় গো-যান। রাস্তা ভাল। একটা মহাসড়কের কাজ চলার কারণে এ পথে অন্য যানের যাতায়াত আপাততঃ বন্ধ। গো-শকটের প্রাচুর্য আছে এখানে। অল্পতেই পেয়ে গেলাম একখানা। বাঘাবনে পৌঁছাতে হলো বিকেলে। মোটামুটি উন্নতই গ্রামটা। বাড়ীঘর বেশির ভাগই পাকা। দ্বিতল কক্ষের বাড়ীও বেশ কয়েকটি বিদ্যমান। দ্বিতল কক্ষের একটি মস্তবড় বসত বাটির তল দিয়ে অল্প একটু এগিয়ে এলো গাড়ী। নামিয়ে দিল এক প্রশস্ত স্কুল প্রাঙ্গণে। পরে জানলাম, ঐটিই হেনাদের বসতবাটি। www.boighar.com

এই স্কুল প্রাঙ্গনেই তৈরী হয়েছে মস্তবড় প্যান্ডেল। বহুকক্ষ বিশিষ্ট স্কুল বিল্ডিং এ পাতা হয়েছে খাট, চৌকি, চেয়ার টেবিল। রান্নার জন্যে একটি ছাপড়া ঘর তোলা হয়েছে পাশেই। আয়োজনটা বেশ পছন্দ সই। শুনলাম, শিল্পীদের স্বাচ্ছন্দ বিধানে গ্রামবাসীরা নিজেদের আসবাব পত্র চাওয়া মাত্র সাপ্লাই দিয়েছে অকুণ্ঠ চিত্তে। বুঝলাম শিল্পের কিছু আদর আছে এ অঞ্চলে। নরকের প্রশ্ন এদের কাছে প্রকট নয় ততটা।

আমি হাজির হতেই ছুটে এলেন ম্যানেজার সাহেব। বললেন, স্যার, বড় সাহেব (রহমান সাহেব) বলেছিলেন, আপনি নিরিবিলি পছন্দ করেন। এসব ঘরেই উঠবেন, না অন্যখানে যাবেন?

বললাম, "অন্য ব্যবস্থা আছে?"

ম্যানেজার বললেন, "কয়েকটা আছে স্যার। তার মধ্যে ঐ যে মাঠের পাশে একটা ছোট্ট নতুন কক্ষ দেখছেন, ঐটেই উত্তম। কোন অফিসার বা বাইরের কেউ এলে তাদের থাকার ব্যবস্থা না থাকায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণ করেছে ঐ কক্ষটা। পাকা ল্যাট্রিন, বাথরুম, টিউবওয়েল, সবই আছে স্যার।

বললাম, "বেশ, তাহলে ওখানেই চলুন।"

যেতে যেতে ভাবলাম, একটা নিতান্তই পথের মানুষের প্রতি হেনার এই আগ্রহ শেষ প্রর্যন্ত ধোপে টিকে কিনা তা যাচাই করা দরকার। তাই ম্যানেজারকে আমার যথার্থ পরিচয় গোপন রাখতে বললাম এবং অন্যকেও সে কথা বলে দেয়ার নির্দেশ দিলাম।

কক্ষটি খোলাই ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখি খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। খাট-তোষক, চেয়ার-টেবিল আলনা-স্ট্যান্ড যথা স্থানে স্থাপিত। সবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। খাটের উপর বেডিংটা রাখতেই কোথা থেকে হৈ হৈ করে ছুটে এলো ইউনিয়ন পরিষদের

বইঘর.কম ও রোকন

চৌকিদার। বললো, "একি। কে আপনারা ? এখানে উঠেছেন কেন ? এ ঘর কাউকে দেয়া যাবে না।"

ম্যানেজার বললেন, কি রকম ? এখানকার কর্মকর্তা "মানে চৌধুরী সাহেব যে বললেন, এ ঘরও আপনারা ইউজ করতে পারবেন ?"

চৌকিদার বললো, "হেনা আপা মানে ঐ চৌধুরী সাহেবের মেয়েই আজ এসে এটা রিজার্ভ করে রেখে গেছেন। তার নাকি একজন গেস্ট আসবেন।"

সবিস্ময়ে চৌকিদারকে প্রশ্ন করলাম, "হেনা! কি করে তোমার হেনা আপা ?"

উত্তরে চৌকিদার বললো, মস্তবড় বিদ্বান! মেয়ে কলেজের প্রফেসর।

নিঃসন্দেহ হয়ে চৌকিদারকে বললাম, "উঠেছি যখন উনি নিজে এসে বের করে না দিলে আর বোরোবো না। এ কথা তাকে গিয়ে বলতে পারো।"

রেগে টং হয়ে চলে গেল চৌকিদার। ম্যানেজার সাহেব বললেন, "কি দরকার স্যার খামাখা ফ্যাসাদ করার। আসুন আরো ভাল জায়গা আছে।"

হাসি মুখে বললাম, "ভয়ের কোন কারণ নেই আপনি যান। আমি ঠিকই ম্যানেজ করে নেবো।

একটু ইতস্ততঃ করে চলে গেলেন ম্যানেজার। আমি বেডিংটা অল্প একটু বিছিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়লাম জিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনে। একটু পরেই বারান্দায় দু'তিন জনের পদ শব্দ পেলাম। দরজার কাছে পৌঁছেই রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো হেনা । বললো, ঘরে কে আছেন।

আমি হাসি মুখে বললাম, "ভেতরে আসুন।"

হেনা চিনতে পারলো কণ্ঠ আমার। ঘরে ছুটে এসে সে স-উল্লাসে বললো, "ওম্মা! আপনি! কখন এলেন ?"

বললাম, "এই কিছুক্ষণ আগে। এসেই তো পড়ে গেছি থাকার জায়গার সমস্যায়। চৌকিদার তো ঢুকতেই দেয় না ঘরে। কে যেন গেস্ট আসবে আপনার! কে সে ভাগ্যবান ?"

হেনা কপট রোষে বললো, "বটে! তেমন কাউকে দেখার ইচ্ছে আছে বুঝি ?"

বললাম, ভাগ্যবানকে দেখার ইচ্ছে কার না থাকে ?"

– তাহলে অপেক্ষা করে থাকুন। কোন ভাগ্যবানের উদয় যদি সত্যি সত্যিই হয়, তখন তাকে সইতে পারলে হলো!"

কথা শেষ করেই হেনা চৌকিদারকে হুকুম করলো, বাথরুমে পানি দিয়ে সব ঠিকঠাক করে দেয়ার জন্যে। চৌকিদার কাজে যেতেই দেখি, দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আর একটি ছোট্টমেয়ে। হেনা বললো– "ও আমার চাচাতো বোন।" "মেয়েটাকে ডাক দিয়ে বললো, আয়, ভেতরে আয়।"

মেয়েটি ভেতরে এসে একলক্ষ্যে দেখতে লাগলো আমাকে। পরে হেনার দিকে চেয়ে বললো, "এই মানুষ সেই মানুষ, তাই নয় আপা ?"

হেনা অবাক হয়ে বললো, "সেই মানুষ মানে ?"

মেয়েটি বললো, "ঐ যে, যার বাধানো ছবি আপনার ট্রাংকের মধ্যে আছে ? ঠিক এই রকমই তো দেখতে।"

লজ্জা পেলো হেনা। বললাম, "আমার ছবি তুললেন কখন ?"

হেনা বললো, "তুলিনি। নেগেটিভ থেকে পজিটিভ করে নিয়েছি।"

– সেই নেগেটিভটাই বা পেলেন কোথায় ?

– ট্রেনে। আপনার ছবিগুলো পাঠিয়েছিলাম। সাথে নেগেটিভটা পেয়ে ছিলেন কি?

খেয়াল হলো। বললাম, "তাই নাকি। আমি ভেবেছিলাম, হয়তো নেগেটিভটা ছাড়া পড়েছে ট্রেনে। ওটা আপনি পান নি। পয়লা ঘাটেই চুরি ?"

মুখ চেপে হাসতে লাগলো হেনা। বললো, ওসব কথা থাক। যাত্রা নাটকের গন্ধটা কাজ দিয়েছে দেখছি। সত্যি সত্যিই এলেন আপনি ?

হেনার মুখের দিকে চেয়ে একটু নীরব থেকে বললাম, "যাত্রা নাটকই কি মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় কিছু ?"

– ওটা আপনি বোঝেন ?

– আপনার কি অনুমান ?

আমার অনুমানটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। হেসে ফেললো হেনা।

পরের দিন স্টেজ প্যান্ডেলের তদারকি করতেই গড়িয়ে গেল দুপুর। বিকেলে আগত শিল্পীদের সাথে দেখা করতে কেটে গেল দিন। সে দিন হেনার সাথে কোন

বইঘর.কম ও রোকন

কথাই হলো না। ১৬ তারিখ সকাল বেলাই হাজির হলো হেনা। বললো, কাল দু' দু'বার এসে ঘুরে গেছি। শুনলাম, আপনিও নাকি পার্ট করবেন এই নাটকে? কথাটি কি সত্যি ?

লক্ষ্য করলাম, হেনার চোখে মুখে বিপুল উৎসাহ। বললাম, "হ্যাঁ", নামকা ওয়াস্তে দ্বার প্রহরীর পার্ট একটা করতে পারি এই আর কি। দলটার সাথে আমার উঠা বসা আছে কিনা।

কিছুটা নিরুৎসাহ হলো হেনা। বললো–

– স্রেফ দ্বার প্রহরী ? আপনার মতো লোক–!

– আমি আর এমন কি তোড়ের মানুষ বলুন ? তবে দেখি, ওর সাথে আর কোন ছোট খাটো রোল যোগ করতে পারি কিনা।

– হ্যাঁ তাই দেখবেন। আপনাকে শুধু ঐ অবস্থায় দেখলে বড্ড খারাপ লাগবে আমার। তাছাড়া সাথে আমার কিছু বান্ধবীও থাকবে।

– আচ্ছা। তাহলে আসছেনই আপনি বই দেখতে ?

– আসবো বতো বটেই। এমনিতেই আসতাম, তার উপর আপনি নামছেন অভিনয়ে! আর কথা আছে ?

– ফাইন!

– ও হ্যাঁ, আপনি যেন তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না দলের সাথে।

– কেন ?

– কেন মানে। এস্পার ওস্পার বলে একটা প্রশ্ন আছে না আমাদের ?

আড়চোখে চেয়ে মুখটিপে হাসতে লাগলো হেনা।

যথা সময়ে শুরু হলো বই। প্রহরী হয়ে শুরু করে রাজপুত্র হয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম বউ সহ। শেষ হলো পালা। উন্মত্ত উল্লাসে আত্মহারা হলো অগণিত দর্শক!

মেকআপ তুলছি গ্রীণ রুমে, এমন সময় একজন এসে কানে কানে খবর দিলো– আমার আস্তানায় অপেক্ষা করছে হেনা। ক্ষীপ্রহস্তে মেকআপ তুলে ঘরে ফিরে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে হেনা। সাথে দু'টি ছোট মেয়ে আর সেই চৌকিদার। আমাকে দেখেই বারান্দা থেকে নেমে এলো সে। বললো, "কোন

রসের আলাপ করার জন্যে নয়, শুধু একটা কথা বলার জন্যেই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। আপনি শুধু মিথ্যাবাদীই নন, একজন মস্তবড় প্রবঞ্চক।

আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই দল বল নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো হেনা। হতবুদ্ধি হয়ে আমি ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ।

পরের প্রায় সারাদিনটাই বসে রইলাম ঘরে। হেনার খবর পেলাম না। অত্যান্ত অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলাম অনুক্ষণ। অসুস্থতার অজুহাতে সে রাতে দলের নায়ককে দিয়ে চালিয়ে নিলাম আমার রোল। তার পরের দিন সকাল সকাল শুরু হলো বাঁধাছাঁদা। তবু হেনার কোন পাত্তা নেই। খানিক পরে স্কুলের মাঠে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেল গরুর গাড়ী। শিল্পীরা সব বেরিয়ে পড়লো তৈরী হয়ে। তবুও হেনা এলো না। অগত্যা বাধ্য হয়ে চৌকিদার মারফত হেনার কাছে খবর পাঠিয়ে স্কুলের মাঠে গেলাম। রহমান সাহেবকে বললাম, আমি তো আর আপনাদের সাথে যাবো না। আমি ফিরে যাবো বাড়ীতে। আপনারা যান। আমার একটু দেরী হবে যেতে।

এরপর আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট গাড়োয়ানটাকে খানিকক্ষণ পরে আসতে বলে দিয়ে, সবার সাথে করমর্দন করে ফিরে এলাম কক্ষে। চৌকিদার ফিরে আসেনি তখনও। একে একে বিদায় হলো সব গাড়ী। আমি পড়ে রইলাম জনশূন্য পরিবেশে। খানিক পরে চৌকিদার ফিরে এলো একা। বললো, "হেনা আপা এলেন না। বল্লেন, গিয়ে বলো, আমি ব্যস্ত আছি। আমার সময় নেই।"

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "ব্যস্ত আছেন মানে! কি করছেন উনি ?"

– ঘরে শুয়ে আছেন।

– শুয়ে থেকে বললেন, ব্যস্ত আছেন ?

– কি জানি। সব বড়লোকের মেজাজ মর্জি। এই ভাল– এই খারাপ।

চলে গেল চৌকিদার। হেনা যে আর আসবে না তা পরিষ্কার। কিন্তু কি এমন ঘটলো যার জন্যে তার এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ? এই জন্যেই কি হেনা আমাকে ডেকে আনলো বাঘাবনে ? আদর করে ডেকে এনে অপমান করে বিদায় করাই কি উদ্দেশ্য ছিল তার ? আমি নায়কের রোলে নামছি– এটা তাকে না বলায় এতবড় কি অন্যায় হয়েছে যে, এতখানি পরিবর্তন হবে তার!

বসে বসে এলোমেলা ভাবছি এমন সময় সেই ছোট্ট মেয়েটি এসে একটা শ্লিপ দিলো আমার হাতে। "বললো, হেনা আপা আপনাকে চলে যেতে বললেন।"

বইঘর.কম ও রোকন

খুব বেশী বিস্মিত আর হলাম না। বললাম, "তাহলে উনি আর আসবেনই না দেখা করতে?"

মেয়েটি বললো, "কি করে আসবে। আজ আপার বর আসছে যে!" বিস্মিত এবার হতেই হলো। বললাম, "আজ তোমার আপার বিয়ে?"

মেয়েটি যেতে যেতে বললো, আজ কেন ? আপার বিয়ে হয়েছে সেই কবে।

শুনেই আঁতকে উঠলাম ভূত দেখারও অধিক। ধক করে একটা আঘাত লাগলো হৃদপিন্ডে। থর থর করে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ। মনে হলো, এ খবরের চেয়ে কেউ যদি আমার মাথায় একটা শক্ত করে ঘা মারতো মুগুর দিয়ে, তাও হয়তো সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু এটাতো আর পারিনে। মনে পড়তে লাগলো, এখানে আসা অবধি হেনার কিছু হেয়ালী কথাবার্তার কথা। তার অর্থ কি তবে এই ?

টলতে টলতে গিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে মেলে ধরলাম শ্লিপ। হেনা লিখেছেঃ

"ক্ষমা চাওয়ার জন্যে আমি লিখছি না। খবরটা বলার জন্যে লিখছি। আপনার সাথে এযাবৎ আমি যা করেছি তা সব নিছক অভিনয়। কারণ, আমি বিবাহিতা। আমার বর আছে। তাকে আনতে লোক গেছে। হয়তো এসে পড়বেন আজই। কাজেই ভরাডুবিটা স্বচোক্ষে না দেখে আপনার চলে যাওয়াই মঙ্গল।

হাত থেকে অলক্ষ্যে খশে পড়লো শ্লিপটা। অন্ধকারে ঢেকে এলো পৃথিবী। এক মুহূর্তে একেবারেই অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। একি নির্মম বঞ্চনা! একি দুর্বিসহ নিঃস্বতা। বেঁচে থাকার একবিন্দু অবলম্বনও অবশিষ্ট রইল না আর। যদি হেনার পক্ষেও সম্ভব হয় এতখানি প্রতারণা, তবে আর কার জন্যে, কিসের আশায় এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা আমার। www.boighar.com

বেহুশ হয়ে কতক্ষণ পড়ে ছিলাম বিছানায় খেয়াল নেই। খেয়াল হলো গাড়োয়ানের ডাকে। সে দুয়ারের কাছে এসে বললো, – "গাড়ী নিয়ে বসে আছি স্যার, কখন যাবেন ?"

ধরমড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। লক্ষ্যকরে দেখি, দুই চোখের পানিতে ভিজে গেছে বালিশ। কোন মতে বললাম, – "দাঁড়াও আসছি।"

বাঘাবনে আমার আর একদন্ড থাকার ইচ্ছে হলো না। অ-পটু হাতে টলতে টলতে জড়াতে লাগলাম বিছানা। আমার অবস্থা হয়তো কিছুটা আঁচ করতে

বইঘর.কম ও রোকন

পেরেছিল চৌকিদার। সে এগিয়ে এসে বললো, "রাখেন স্যার, আমি সব বেঁধে ছেঁদে তুলে দিচ্ছি গাড়ীতে।"

www.boighar.com

সব কিছু গুছিয়ে গাড়ীতে এসে তুলে দিলো চৌকিদার। মাতালের মতো অসমান ধাপ ফেলে গাড়ীর কাছে এসে কয়টি টাকা গুঁজে দিলাম চৌকিদারের হাতে। গাড়ীতে উঠে বসতেই গাড়োয়ান মুখে একটি ইঙ্গিত সূচক শব্দ করে বলদ দু'টোকে নির্দেশ দিলো "এই চল-চল।"

গড় গড় করে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ী, কড় কড় করে শব্দ করছে তৈল বিহীন চক্রদ্বয়। মনে হচ্ছে, চুরমার হয়ে গুড়িয়ে যাচ্ছে আমার বুকের হাড় হাড্ডি।

গাড়ী চলতে লাগলো হেনাদের সুউচ্চ দ্বিতল কক্ষের কোল ঘেঁষে। আমি অকারণেই একবার চোখ তুললাম উপরে। দেখি, উপর তলায় বারান্দার রেলিং ধরে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে হেনা। ঘৃনায় কুঞ্চিত হলো সর্বাঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলাম চোখ। তার মুখমন্ডলে বিষাদের না বিদ্রুপের আভাস-তা দেখার আমার ইচ্ছে হলো না আদৌ। শুধু মনে হলো, শেকস্‌পীয়ার তাঁর ডাইনীদেরও এতখানি নির্ম্মম করে তৈরী করতে পারেননি।

গ্রাম ছেড়ে গাড়ীখানি চলতে লাগলো ফাঁকা মাঠের পথ ধরে। রিক্তমন আর সিক্ত আঁখি দিয়ে আমি পরিমাপ করতে লাগলাম সীমাহীন আকাশের শূন্যতা। হঠাৎ একটি কিশোর সাইকেল মেরে ছুটে এলো গাড়ীর সামনে। - "আপনার চিঠি" বলে একটা ভাজ করা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে সে আবার যেমন এলো, চলে গেল তেমনি করে।

খুলে দেখি, হেনার লেখা। একবার মনে হলো, ফিকে মারি কাগজটা। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে লাগলাম চিঠি। হেনা ক্ষীপ্র হাতে লিখেছেঃ

"ভেবেছিলাম আসল ঘটনা বলবোনা"। কি হবে আর নিজের পক্ষে সাফাই গেয়ে। কিন্তু আপনাকে দেখে আর পারলাম না। পরিস্থিতি আঁচ করে যদি মনটা আপনার হালকা হয় কিঞ্চিৎ এই আশাতেই লিখলাম। আমার সিদ্ধান্ত আমি ঠিক করেই রেখেছি।

আমি জানতাম না আমি বিবাহিতা। আমার বিয়ে হয় ছোটকালে। আব্বা তখন সে বিয়ে অস্বীকার করে চেপে রাখেন সব কথা। এখন উনি খোঁজ পেয়েছেন, সেই বর সুপুরুষ, বিত্তশালী, বিলেত ফেরত। তাই ঐ বিয়ে এখন উনি জায়েজ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। বিয়েটাও আবার অদ্ভুদ ভাবেই হয়।

বইঘর.কম ও রোকন

আমি তখন হাঁটতে শিখেছি কেবল। ফরিদপুরে নানীর বাড়ীতে ছিলাম। তখন নানীর এক সই সেখানে বেড়াতে আসেন তার ছোট্ট একটা নাতীকে সাথে নিয়ে। একদিন ঘাটে বাধা এক নৌকা থেকে আমি পড়ে যাই পানিতে। ঐ ছেলেটা তা টের পেয়ে আমাকে তোলার জন্যে পানিতে ঝাঁপ দিতেই টের পায় সকলে। ওর জন্যেই আমি বেঁচে যাই বলে নানী ওর সাথেই আমার বিয়ে দেন কোলে কোলে। কিন্তু আব্বা এসে শুনেই রেগে যান ভয়ানক। তখনই আমাকে কেড়ে নিয়ে চলে আসেন বাঘাবনে। এই আমার বিয়ে। ঐ ছেলেটার বাড়ীও আবার আপনাদের ওদিকেই। কি যেন গায়ের নাম– ও–হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাতির বিল-হাতির বিল।

আবার থর থর করে কেঁপে উঠলো সর্বাঙ্গ। এই হেনাই আমার সেই শিশুকালের বউ। পেছন ফিরে দেখি, এখনও দেখা যাচ্ছে হেনাদের দ্বিতল কক্ষের বারান্দা। হেনা অমনি ভাবে চেয়ে আছে আমার গাড়ীর দিকে।

ক্ষণিকের তরে হারিয়ে ফেললাম সম্বিত। তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলাম এই অবিশ্বাস্য যোগসূত্রের কথা, আমার এই চলন্ত জীবন নাট্যের কথা, আর সেই সাথে এ নাটকের পরিচালকের কথা। অপূর্ব অপেরার পরিচালক আমি। কতটুকু অপূর্ব বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারি আমি বা পারে আমার অপেরা ? আমার মাথার উপরে বসে যে মহাপরিচালক অপূর্বাতীত অপূর্ব, বিস্ময়াতীত বিস্ময়কর বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করতেই আছেন প্রতিনিয়ত, তার কাছে আমাদের অপেরাগুলি কতই না তুচ্ছ। তাঁর দৃশ্যের কাছে আমাদের দৃশ্যগুলি কতইনা কিঞ্চিতকর।

ভাবতে লাগলাম, এমন একটি বিস্ময়কর অপেরা চোখের সামনে রেখে আমাদেরটাকে আমরা বলি–অপূর্ব অপেরা। এ মুর্খামী মার্জনাহীন।

আনন্দের আতিশয্যে ঝাপসা হলো চোখ। গাড়োয়ান হকচকিয়ে গিয়ে থামিয়ে দিলো গাড়ী। আমার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বললো, কি হলো স্যার। আপনার চোখে পানি।

আমি কোন মতে বললাম, “গাড়োয়ান, গাড়ী ঘুরাও। শিগগির।”

**সমাপ্ত**

**www.boighar.com**